Journal of Sociology
Vol. 14 Issue 1 & 2, 2023
ISSN: 1813-2871

Nazmul Karim Study Center
University of Dhaka

বাংলা বাগ্‌ধারায় সমাজচিত্র রূপায়ণে সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা – একটি পর্যালোচনা

(The Role of Sanskrit Literature in Illustrating the Social Condition through Bengali Idioms- A Review)

তিতাস কুমার শীল*

সারসংক্ষেপ

বাংলা ভাষা পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ একটি ভাষা। এ ভাষায় প্রচুর বাগ্‌ধারা রয়েছে। একাধিক নির্দিষ্ট পদ একটি বাক্যে আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে যখন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে তখন তাকে বাগ্‌ধারা বলে। মনের ভাব সুন্দর করে প্রকাশ করার জন্য বাগ্‌ধারার ব্যবহার হয়ে থাকে। বক্তব্যকে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করার প্রবণতা থেকেই বাগ্‌ধারার সৃষ্টি। বাংলা ভাষায় প্রচুর বাগ্‌ধারা আমরা পাই যার একটা প্রধান উৎস রয়েছে সংস্কৃত সাহিত্যে। সংস্কৃত ভাষায় মহাকাব্য, কাব্য, পুরাণ, গল্পসাহিত্য প্রভৃতি রচিত হয়েছে। এগুলো সাধারণত মানব জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত। সংস্কৃত সাহিত্যের বহু ঘটনা বাগ্‌ধারা হিসেবে বাংলা ভাষায় এসেছে। কিন্তু সমাজের বেশিরভাগ মানুষ এ বাগ্‌ধারাগুলোর উৎস জানে না, কথোপকথনের সময় অজান্তেই তারা এগুলো ব্যবহার করে। আমাদের দৈনন্দিন আলাপ আলোচনায় জনপ্রিয় কিছু পৌরাণিক বাগ্‌ধারার ইতিহাস ও বর্তমান সমাজের কোন ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তার আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মূলশব্দ: সংস্কৃত সাহিত্য, পৌরাণিক কাহিনি, বাংলা ভাষা, বাগ্‌ধারা, বর্তমান সমাজ, তুলনামূলক বিশ্লেষণ।

Abstract

Bengali language is an important language over the world. There are enormous idioms in this language. An idiom is one kind of phrase or expression which has a meaning that can't be analyzed by explaining the individual words. Idioms are used to express the thought aesthetically. The roots of many Bengali idioms can be tressed from Sanskrit. There are many epics, kavyas, puranas, story literature written by Sanskrit language. Those are evolved around the events of human life. Many incidents are transmitted to idioms in Bengali language from Sanskrit. But most of the people in our society don't know the origin of the idioms, they use it spontaneously in their conversation. This article assesses usages of mythical idioms and its history of origin as well as stark connections with the daily incidents.

* সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ই-মেইল: titasdu06@gmail.com

DOI:

মানুষের মনের ভাব প্রকাশের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো ভাষা। ভাষার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন হয়। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। এ ভাষায় প্রচুর বাগ্‌ধারার ব্যবহার রয়েছে। এটি ভাষার বাক-প্রবাহের একটি বিশেষ ধরন। বাগ্‌ধারা অর্থ বিশেষ অর্থপূর্ণ কথা। বাগ্‌ধারার অন্য নাম বাগ্‌বিধি। সাধারণত যে শব্দ বা শব্দসমষ্টি আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে অর্থাৎ শব্দের সাধারণ অর্থকে অতিক্রম করে বিশেষ ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে তাই বাগ্‌ধারা। বাগ্‌ধারার কারণে বাক্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি ঘটে, ভাষা হয়ে ওঠে আরও সমৃদ্ধ, প্রাণবন্ত ও প্রাণময়। বাগ্‌ধারা ভাষাকে করে গতিশীল, আকর্ষণীয় ও শ্রুতিমধুর। ভাষাকে রসাত্মকভাবে উপস্থাপন করা হয় বাগ্‌ধারার দ্বারা। সাধারণত বিখ্যাত কোনো ঘটনা থেকে জন্ম হয় বাগ্‌ধারার। সাধারণত কোনো সাহিত্য বা লোককাহিনির কোনো বিখ্যাত ঘটনা যদি মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে যায় তখন মানুষ তাদের প্রতিদিনের কথা-বার্তায় সেই বিখ্যাত ঘটনাটি বারবার টেনে আনে। ফলে জন্ম নেয় শ্রুতিমধুর বাগ্‌ধারার। বাংলা ভাষায় প্রচুর বাগ্‌ধারা আমরা পাই যার উৎস উদ্ঘাটন করতে গেলে সংস্কৃত সাহিত্যের দ্বারস্থ হতে হয়। এদিক থেকে বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষার কাছে ঋণী। আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনা করা হয়েছে বাংলা ভাষার বহুল প্রচলিত কিছু বাগ্‌ধারা নিয়ে, যেগুলোর মূল কাহিনি সংস্কৃত সাহিত্যে রয়েছে।

অকালবোধন – অকাল শব্দের অর্থ 'অসময়' এবং বোধন শব্দের অর্থ জাগরণ। অর্থাৎ 'অকালবোধন' শব্দের অর্থ হলো অসময়ে জাগরণ। শারদীয় দুর্গাপূজাকে অকালবোধন বলা হয়। শাস্ত্রমতে, বসন্তকাল দুর্গাপূজার উপযুক্ত সময়, শরৎকাল নয়। যদিও বর্তমানে শারদীয় দুর্গাপূজা অধিক প্রচলিত। পৌরাণিক বিশ্বাস অনুসারে শরৎকালে দেবতারা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকেন তাই এসময় পূজার প্রকৃত সময় নয়। দেবতাদের দিন ছয় মাস (মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়) এবং রাত্রি ছয় মাস (শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ)। দেবতাদের দিনকে বলে উত্তরায়ণ আর রাত্রিকে বলে দক্ষিণায়ন। উত্তরায়ণে দেবতারা জেগে থাকেন, দক্ষিণায়নে ঘুমিয়ে থাকেন। যুদ্ধে জয়লাভের জন্য রামচন্দ্রের দেবীপূজার প্রয়োজন হয়েছিল। তাই আশ্বিন মাসে ঘুমিয়ে থাকা দেবীকে জাগাতে (বোধন) হয়েছিল। কালিকাপুরাণে আছে রামচন্দ্রের বিজয়ের জন্য শারদীয় দুর্গাপূজা করা হয়,

> রামস্যানুগ্রহার্থায় রাবণস্য বধায় চ।
> রাত্রাবেব মহাদেবী ব্রহ্মণা বোধিতা পুরা ॥
> ততস্তু ত্যক্তনিদ্রা সা নন্দায়ামাশ্বিনে সিতে।
> জগাম নগরীং লঙ্কাং যত্রাসীদ্রাঘবঃ পুরা ॥
> * * * *
> নিহতে রাবণে বীরে নবম্যাং সকলৈঃ সুরৈঃ।
> বিশেষপূজাং দুর্গায়াশ্চক্রে লোকপিতামহঃ ॥
>
> কালিকাপুরাণ, ৬০/২৬-২৭, ৩২[১]
>
> অর্থাৎ, প্রাচীনকালে রামের অনুগ্রহে এবং রাবণকে হত্যার জন্য দেবীদুর্গা রাত্রিতে ব্রহ্মার দ্বারা বোধিত হয়েছিলেন। তারপর মহাদেবী ঘুম থেকে উঠে আশ্বিনমাসে রাবণের আলয় লঙ্কায় গিয়েছিলেন, যেখানে রাম পূর্বেই ছিলেন। -------- লঙ্কেশ্বর রাবণ নিহত হলে লোকপিতামহ ব্রহ্মা নবমী তিথিতে সকল দেবতাকে সঙ্গে নিয়ে দেবীদুর্গার বিশেষ পূজা করেছিলেন।

কালিকাপুরাণ অনুসারে রামচন্দ্র নিজে দেবীর পূজা করেননি, ব্রহ্মা করেছিলেন। যাইহোক, অসময়ে দেবীকে জাগানো হয়েছিল বলেই শারদীয় দুর্গাপূজাকে 'অকালবোধন' বলে। কৃত্তিবাসী রামায়ণেও দেবীর অকালবোধনের কথা আছে।

আমরা যখন একে অপরের সাথে ভাব বিনিময় করি বা কথা বলি তখন আমরা প্রায়ই এই বাগ্‌ধারাটি বলে থাকি। প্রত্যেকটি কাজের নির্দিষ্ট সময় আছে, নির্দিষ্ট সময় ছাড়া কোনো কাজ

করলে তেমন সুফল আসে না। এমতাবস্থায় কেউ যদি সময়ের পূর্বেই কোনো কাজ করে তখন সেই শরৎকালে অর্থাৎ অকালে দুর্গাপূজার প্রসঙ্গ টেনে অকাল বোধন বাগ্‌ধারাটি ব্যবহার করা হয়।

অগস্ত্য যাত্রা–'অগস্ত্য যাত্রা' এ বাগ্‌ধারাটির অর্থ চিরপ্রস্থান বা চিরবিদায়। চিরকালের জন্য কেউ কোনো স্থান ত্যাগ করলে, আর ফিরে না আসলে সেই যাত্রাকে অগস্ত্য যাত্রা বলে। ঋষি অগস্ত্য একজন প্রসিদ্ধ ও ক্ষমতাশালী ঋষি ছিলেন। বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে অগস্ত্য মুনির নাম পাওয়া যায়। পুরাণমতে, বিন্ধ্য পর্বত ছিল ঋষি অগস্ত্যের শিষ্য। বিন্ধ্য পর্বতের ইচ্ছা ছিল সূর্য যেমন সুমেরু পর্বতকে প্রদক্ষিণ করেন তেমনি সূর্য তাকেও যেন প্রদক্ষিণ করেন। তাই বিন্ধ্যপর্বত সূর্যদেবকে তাকে প্রতিদিন প্রদক্ষিণ করার জন্য বললেন। কিন্তু সূর্যদেব রাজি হলেন না। তিনি বললেন, সৃষ্টির শুরু থেকে আমি যেমন প্রদক্ষিণ করি তেমনই করবো। বিন্ধ্যপর্বত তখন ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে নিজের উচ্চতা বৃদ্ধি করতে লাগলেন। উচ্চতা অতিরিক্ত বৃদ্ধির ফলে সূর্যের পথ রোধ হলো। সূর্যের পথ রোধ হওয়ায় দেবতারা ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। বিন্ধ্য-পর্বতকে থামাতে না পেরে শেষে দেবরাজ ইন্দ্র অগস্ত্য মুনির কাছে আসলেন। মুনি সব শুনে বিন্ধ্য পর্বতের কাছে উপস্থিত হলেন এবং বিন্ধ্যপর্বতকে নত হতে বললেন। তিনি আরও বললেন যে আমি আজ দাক্ষিণাত্যে তীর্থ স্নান করবো। যতক্ষণ ফিরে না আসি ততক্ষণ নত হয়ে থাকো। তাঁর কথা শুনে বিন্ধ্য পর্বত নত হলো। পুরাণমতে–

> অগস্ত্যোঽপি সমাসাদ্য তস্যান্তং দক্ষিণং দ্বিজাঃ।
> ত্বয়ৈবং সংস্থিতেনৈব স্থাতব্যমিত্যুবাচ তম্ ॥
> যাবদাগমনং মহ্যং নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
> নো চেচ্ছাপং প্রদাস্যামি যেন যাস্যসি সংক্ষয়ম্ ॥
> স তথেতি প্রতিজ্ঞায় শাপাঙীতো নগোত্তমঃ।
> ন জগাম পুনর্বৃদ্ধিং তস্যাগমনবাঞ্ছয়া ॥
> সোঽপি তেনৈব মার্গেণ নিবৃত্তিং ন করোতি চ।
> যাবদদ্যাপি বিপ্রেন্দ্রা দক্ষিণাং দিশমাশ্রিতঃ ॥
>
> স্কন্দ-পুরাণম্, (ষষ্ঠ ভাগ), নাগর খণ্ড, ৩৩/৪০-৪৩[৩]

> অর্থাৎ, মহামুনি অগস্ত্য দক্ষিণ দিক প্রাপ্ত হলেন। এবং বিন্ধ্য পর্বতকে বললেন, আমি যতক্ষণ পর্যন্ত না ফিরে আসি ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি এইভাবে অবস্থান করো। এর ব্যতিক্রম যেন না হয়, ব্যতিক্রম হলে তোমাকে অভিশাপ দেব। এ অভিশাপে তুমি ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। বিন্ধ্যপর্বত শাপভয়ে বৃদ্ধিপাপ্ত না হয়ে মুনির আসার অপেক্ষায় রইলেন। মুনি এ পথে ফিরে না এসে দক্ষিণ দিক গমন করলেন।

অগস্ত্য মুনি আর বিন্ধ্যপর্বতের দিকে ফিরে আসলেন না। তিনি বিন্ধ্যপর্বতকে বলেছিলেন ফিরে আসবেন কিন্তু আর ফিরে আসেননি। বিন্ধ্যপর্বত মুনির অপেক্ষায় চিরদিন নত হয়ে রইল। তাই আমাদের সমাজের কেউ যদি চিরকালের জন্য চলে যান বা চিরদিনের জন্য কোনো স্থান ত্যাগ করেন অর্থাৎ যার ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনা নেই, এ ধরনের ঘটনা ঘটলে আমরা বলি ঐ ব্যক্তির অগস্ত্য যাত্রা ঘটেছে।

অগ্নি পরীক্ষা–অগ্নি পরীক্ষা শব্দের অর্থ কঠিন পরীক্ষা। 'অগ্নি পরীক্ষা' এ বাগ্‌ধারাটি বাংলায় এসেছে মহাকাব্য রামায়ণ থেকে। রামায়ণে লঙ্কার অধিপতি রাবণ সীতাকে অপহরণ করে লঙ্কায় নিয়ে যান। সীতাকে উদ্ধারের জন্য রাবণের সাথে রামের তীব্র যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে রাবণ পরাজয় বরণ করেন এবং নিহত হন। যুদ্ধশেষে সীতা যখন রামের সম্মুখে আসেন, রাম তাঁকে অপ্রিয় বাক্য বলেন। রাম সীতাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তখন সীতা লক্ষ্মণকে আগুন

জ্বালাতে বলেন। রামের সম্মতিতে লক্ষ্মণ আগুন জ্বালেন। প্রজ্বলিত অগ্নিতে সীতা প্রবেশ করেন। কিন্তু সীতা ছিলেন নির্মল, সচ্চরিত্র, তাঁর মনে ছিল দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি বলেন,

যথা মে হৃদয়ং নিত্যং নাপসর্পতি রাঘবাৎ।
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্বতঃ পাতু পাবকঃ ॥
যথা মাং শুদ্ধচারিত্রাং দুষ্টাং জানাতি রাঘবঃ।
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্বতঃ পাতু পাবকঃ ॥

রামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ড ১১৬/২৫-২৬

অর্থাৎ, যখন আমার হৃদয় রাম হতে সরে যায়নি, তখন লোকসাক্ষী অগ্নি অবশ্যই আমাকে রক্ষা করবে। আমার চরিত্র বিশুদ্ধ কিন্তু রামচন্দ্র আমাকে অসৎ মনে করছেন, সকল পাপ-পুণ্যের সাক্ষী অগ্নি আমাকে রক্ষা করুন।

নির্দোষ নিষ্পাপ থাকার কারণে আগুনে সীতার কিছুই হলো না। এভাবেই দেবী সীতা কঠিন অগ্নি পরীক্ষা দিয়ে সতীত্বের পরিচয় দিলেন।

সমাজে আমাদের বিভিন্ন বাধা-বিঘ্ন পেরিয়ে, ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে এগিয়ে যেতে হয়। জীবন সহজ, সাবলীল নয়। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হয়। মানবজীবন সংগ্রামমুখর। তাই আমাদের কখনো কখনো তীব্র কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়। এ রকম অবস্থা আসলে আমরা রামায়ণের সীতার অগ্নি পরীক্ষার কথা টেনে এনে অগ্নি পরীক্ষা শব্দটি ব্যবহার করি। আমরা প্রায়ই বলি জীবনে অগ্নি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হয়।

কুম্ভকর্ণের নিদ্রা–এ বাগ্‌ধারাটির অর্থ গভীর ঘুম। কুম্ভকর্ণ রামায়ণের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। তিনি ছিলেন রাক্ষসরাজ রাবণের মেজ ভাই। তিনি চরিত্রবান ও দক্ষযোদ্ধা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন তীব্র ঘুম কাতুরে ব্যক্তি। কুম্ভকর্ণ ব্রহ্মার বরে ছয়মাস যাবৎ নিদ্রামগ্ন থাকতেন। ছয়মাস পর একদিন ঘুম থেকে জাগতেন। বিরাট দানব আকৃতির চেহারা ও প্রচুর খাওয়ার কারণে তিনি সর্বদাই ছিলেন আলোচিত।

রামের সাথে রাবণের যুদ্ধ শুরু হলে এক পর্যায়ে রাবণের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। তখন রাবণ কুম্ভকর্ণকে ঘুম থেকে জাগানোর সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু কুম্ভকর্ণের ঘুম সহজে ভাঙ্গে না। কিছুদিন মাত্র তিনি ঘুমিয়েছেন। ছয়মাসের পূর্বেতো ঘুম ভাঙ্গে না। রাক্ষসেরা প্রথমে তাঁর দেহকে চন্দন দিয়ে লেপন করলেন, সুরভিত স্বর্গীয় মালা ও গন্ধের দ্বারা তাঁকে আপ্যায়িত করলেন। ধূপের গন্ধ গৃহকে আমোদিত করে তাঁর স্তুতি করা হলো। কিন্তু কুম্ভকর্ণের ঘুম কিছুতেই ভাঙ্গে না। তখন রাক্ষসেরা তীব্র কোলাহল সৃষ্টি করলো। যুদ্ধকাণ্ডে উল্লেখ আছে–

তং শৈলশৃঙ্গৈর্মুসলৈর্গদাভির্বক্ষঃস্থলে মুদ্‌গরমুষ্টিভিশ্চ।
সুখপ্রসুপ্তং ভুবি কুম্ভকর্ণং রক্ষাংস্যুদগ্রাণি তদা নিজঘ্নুৎ ॥

রামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ড, ৬০/৪০

অর্থাৎ রাক্ষসেরা উপড়ে নেওয়া পাহাড়ের চূড়া, মুষল, গদা, মুগুর এবং মুষ্টি দ্বারা ঘোর ঘুমে আচ্ছন কুম্ভকর্ণের বুকের ওপর আঘাত করতে লাগলো।

কিন্তু তাতেও কিছু হলো না। রাক্ষসেরা কুম্ভকর্ণকে জাগানোর জন্য শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গ বাজাতে লাগলো, বড় বড় কাঠ দিয়ে তাকে আঘাত করলো, কানের ভিতর জল ঢেলে দেওয়া হলো, চুল টানা হলো, কানে কামড়ানো হলো কিন্তু তাতেও কুম্ভকর্ণকে জাগানো গেল না। পরিশেষে অসংখ্য হাতি তাঁর দেহের ওপর উঠিয়ে দিলে কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙ্গলো। রামায়ণে উল্লেখ আছে–

বারণানাং সহস্রঞ্চ শরীরেঽস্য প্রধাবিতম্।

কুম্ভকর্ণস্তদা বুদ্ধা স্পর্শং পরমবুধ্যত ॥
রামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ড, ৬০/৫৫

অর্থাৎ, তারপর হাজার হস্তী তাঁর দেহের ওপর চালিয়ে দিলে কুম্ভকর্ণ একটু জেগে কিছুটা স্পর্শসুখ অনুভব করলেন।

আমাদের সমাজে অনেক মানুষ আছে অলস প্রকৃতির। খুব ঘুম কাতুরে। কাজে-কর্মে তেমন আগ্রহ নেই। সময় পেলে ঘুমিয়ে নেয়। স্বাভাবিকভাবে একটা মানুষের যতটুকু ঘুমের প্রয়োজন তার থেকে তারা অনেক বেশি ঘুমায়। অতিরিক্ত ঘুমের মধ্যে তারা আনন্দ খুঁজে পায়। সমাজে এ ধরনের মানুষ দেখলে তাকে কুম্ভকর্ণের সাথে তুলনা দিয়ে বলে থাকি এ যেন কুম্ভকর্ণের নিদ্রা।

কুরুক্ষেত্র–এ বাগ্‌ধারাটির অর্থ প্রচণ্ড যুদ্ধ। কুরুক্ষেত্র ছিল কৌরব ও পাণ্ডবদের যুদ্ধভূমি। মহাভারত থেকে আমরা কুরু ও পাণ্ডবদের কথা জানতে পারি। কুরু ছিলেন চন্দ্রবংশীয় রাজা এবং কৌরবদের পূর্বপুরুষ। কুরু খুব ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। কুরুরাজ কর্তৃক প্রস্তুত ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র নামে পরিচিত হয়। কুরুর নাম অনুসারে বংশের নাম হয় কৌরব বংশ। এ বংশের দুইজন বিখ্যাত ব্যক্তি হলেন ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু। ধৃতরাষ্ট্রের বংশধররা কৌরব ও পাণ্ডুর বংশধররা পাণ্ডব নামে পরিচিত। কুরুক্ষেত্র ছিল দেবতাদের যজ্ঞ ও তপস্যা করার স্থান। এজন্য এটি 'ধর্মক্ষেত্র' নামেও পরিচিত। গীতার আছে–

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥ গীতা - ১/১

অর্থাৎ, হে সঞ্জয়, ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করার জন্য একত্র হয়ে আমার পুত্রগণ ও পাণ্ডুর পুত্রগণ কী করল?

এখানে দেখা যাচ্ছে, কুরুক্ষেত্রকে ধর্মক্ষেত্র হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ কুরুক্ষেত্রেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার বাণী শুনিয়েছিলেন। কিন্তু কুরুক্ষেত্র স্থানটি সুপরিচিত হয়েছে যুদ্ধের জন্য। মহাভারতে কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল এ কুরুক্ষেত্রে। আঠার দিন ব্যাপী এ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ স্থায়ী হয়েছিল। এ যুদ্ধে বহু যোদ্ধা অংশগ্রহণ করেছিল। মহাভারতে আছে–

শূন্যেব পৃথিবী সর্বা বালবৃদ্ধাবশেষিতা।
নিরশ্বপুরুষেবাসীদ্রথকুঞ্জরবর্জিতা ॥
যাবত্তপতি সূর্যে জম্বূদ্বীপস্য মণ্ডলম্।
তাবদেব সমাবৃত্তং বলং পার্থিবসত্তম্ ॥
মহাভারত, ভীষ্মপর্ব, ১/৭-৮

অর্থাৎ, সেই সময় শুধুমাত্র বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোক গৃহে অবশিষ্ট ছিল; কিন্তু অশ্ব ও সক্ষম পুরুষ, কিংবা রথ ও হস্তী গৃহে ছিল না; সুতরাং পৃথিবী যেন শূন্য হয়ে গিয়েছিল। সূর্য এই জম্বূদ্বীপের যতটা স্থান উত্তপ্ত করে, তত স্থান হতে সৈন্য এসেছিল।

এ ভয়ানক যুদ্ধের তীব্রতা এতই ভয়ঙ্কর ছিল যে উভয়পক্ষের মাত্র অল্প কয়েকজন বেঁচে ছিলেন। আমাদের সমাজে দুই বা ততোধিক পরিবার, গোষ্ঠী, পাড়া বা গ্রামের মধ্যে যখন ভীষণ মারামারি বা ঝগড়া শুরু হয় তখন আমরা এ ব্যাপক ঝগড়াকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কথা মনে করে কুরুক্ষেত্র শুরু হয়েছে বলে থাকি।

কলিকাল–এ বাগ্‌ধারার অর্থ হচ্ছে অনাচারের কাল। বাংলা ভাষায় কলিকাল খুবই জনপ্রিয় একটি শব্দ। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে যুগ চারটি – সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। "সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর

ও কলিযুগের পরিমাণ = ৪৩২০০০০ বছর। সত্যযুগ = ১৭২৮০০০ বছর। ত্রেতা = ১২৯৬০০০ বছর, দ্বাপর = ৮৬৪০০০ বছর, কলি = ৪৩২০০০ বছর।"[৭]

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে সত্যযুগে কেউ পাপ কর্ম করতো না। সকলে সত্য কথা বলতো। অনাচার, ব্যভিচারে কেউ লিপ্ত হতো না। যজ্ঞ, দান প্রভৃতি ধর্মীয় কার্যকলাপে মানুষ ব্যস্ত থাকতো। সমাজে কোনো অশান্তি ছিল না। সকল মানুষ ছিল ব্যাধিশূন্য। সমাজে ধনী-দরিদ্রের কোনো বৈষম্য ছিল না। ত্রেতাযুগে ধর্ম এক পাদ করে বেদের নিয়ম কানুন থেকে সরে এসেছে। এসময় সমাজে সামান্য চৌর্যবৃত্তি, মিথ্যাভাষণ ও কপটতা দেখা দিয়েছিল। এযুগে পুণ্য তিন ভাগ, পাপ এক ভাগ। দ্বাপর যুগে সমাজে অধর্মের কাজ বেশ ছিল। এসময় পুণ্য অর্ধেক, পাপ অর্ধেক। চারযুগের শেষ হচ্ছে কলিযুগ। এসময় অধর্মের আধিক্য থাকবে। পুণ্য হবে এক ভাগ এবং পাপ হবে তিন ভাগ। সমাজে সর্বদা বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখা দেবে। পুরাণমতে, এ সময় সমাজ থেকে বেদবিহিত কার্যকলাপ কমে যাবে। ধর্মের বিধিবিধান সমাজে তেমন প্রতিফলিত হবে না। এ সময় মানুষ হয়ে উঠবে তপস্যাহীন, মিথ্যার বেড়াজালে মানুষ আবদ্ধ হয়ে উঠবে। রাজনীতি হয়ে উঠবে জটিল, শাসক শ্রেণি হয়ে উঠবে দুষ্টপ্রকৃতির, ধনলোভী। ফলে সমাজে খারাপ মানুষের প্রভাব বৃদ্ধি পাবে, অসৎ মানুষের জয়জয়কার থাকবে সর্বত্র। সমাজে যার ধন থাকবে সেই সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হবে। বিষ্ণুপুরাণে আছে,

> যো যো দদাতি বহুলং স স স্বামী তদা নৃণাম্।
> স্বামিত্বহেতুঃ সম্বন্ধো ভাবী নাভিজনস্তদা ॥ বিষ্ণুপুরাণ ৬/ ১/১৯[৮]
>
> অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে যে বেশি পরিমাণে অর্থ প্রদান করবে, সেই ব্যক্তিই তার প্রভু হবে। প্রভুত্বের কারণ সম্বন্ধ হবে না এবং ভালো বংশে জন্মগ্রহণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রভুত্বের কারণ হবে না।

কলিকালের বর্ণনা প্রসঙ্গে পুরাণে আরও বলা হয়েছে, কলিকালে নারীরা স্বেচ্ছাচারিণী হবে, পুরুষেরা অন্যায়ভাবে অর্থ আয় করবে। এসময় মানুষের মধ্যে কোনো ত্যাগ থাকবে না। মানুষ শুধু নিজের স্বার্থই দেখবে। এসময় দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার বৃদ্ধি পাবে। মাতা-পিতাসহ সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠদের মানুষ সম্মান করবে না। মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা তেমন থাকবে না। সমাজে সর্বদা বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। মানুষ হয়ে উঠবে আত্ম-অংহকারী। পুরাণে আছে,

> বিত্তেন ভবিতা পুংসাং স্বল্পেনাঢ্যমদঃ কলৌ।
> স্ত্রীণাং রূপমদশ্চৈব কেশৈরেব ভবিষ্যতি ॥ বিষ্ণুপুরাণ ৬/ ১/ ১৬[৯]
>
> অর্থাৎ, কলিকালে মানুষ অল্প সম্পদের অধিকারী হয়েই অত্যন্ত গর্ব প্রকাশ করবে, স্ত্রীগণ কেবল কেশের দ্বারা নিজেদেরকে খুব সুন্দরী মনে করবে।

মনুসংহিতায় কলিকাল সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এসময় সমাজে মানুষের নৈতিক অধঃপতনের পাশাপাশি আয়ুষ্কালও কমে যাবে। মনুসংহিতায় আছে–

> অরোগাঃ সর্বসিদ্ধার্থাশ্চতুর্বর্ষশতায়ুষঃ।
> কৃতে ত্রেতাদিষু হ্যেষামায়ুর্হ্রসতি পাদশঃ॥ ১/৮৩[১০]
>
> অর্থাৎ, সত্যযুগে মানুষ রোগশূন্য ছিল, সকলের সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হতো। প্রত্যেকেই চারশত বছর বেঁচে থাকতো। ত্রেতাসহ পরের তিন যুগে মানুষের আয়ুর পরিমাণ পর্যায়ক্রমে একশ বছর করে কমে যেতে লাগলো।

বর্তমান যুগে আমরা সমাজের দিকে তাকালে দেখি চারদিক শুধু অরাজকতা, হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানি প্রভৃতি। দুর্নীতিতে পুরো সমাজ ছেঁয়ে গেছে। সমাজে যোগ্যতা, মেধার মূল্যায়ন তেমন নেই। যাদের হাতে অর্থ আছে সাধারণত সমাজের নীতি-নির্ধারক তারাই। অর্থই হচ্ছে

সমাজের মূল। যাদের কাছে অর্থ আছে, তারাই সমাজের প্রধান। তাদের যদি অন্য কোনো যোগ্যতা নাও থাকে তাহলেও সমাজের মানুষ তাদের মূলায়ন করে। সমাজে সৎ শিক্ষিত, মার্জিত ও রুচিবোধ সম্পন্ন মানুষদের মূল্যায়ন তেমন নেই। চারদিকে এ সব বিশৃঙ্খল পরিবেশ, অরাজকতা দেখেই আমরা বলে থাকি ঘোর কলিকাল চলছে।

কংস মামা– কংস মামা এ বাগ্‌ধারাটির অর্থ হলো নির্মম আত্মীয়। পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে কংস ছিলেন মথুরার রাজা উগ্রসেনের পুত্র। কংস ছিলেন ভোজবংশীয় রাজা। তিনি পিতা উগ্রসেনকে ক্ষমতাচ্যুত করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন খুবই অত্যাচারী ও দুষ্ট প্রকৃতির রাজা। তাঁর অত্যাচারে প্রজারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। কংসের বোনের নাম ছিল দেবকী। দেবকীর সাথে বসুদেবের বিবাহ হয়। তাঁদের বিবাহের পর কংস সারথি হয়ে রথ চালনা করেছিলেন। সে সময় তিনি দৈববাণী শুনতে পান,

> পথি প্রগ্রহিণং কংসমাভাষ্যাহাশরীরবাক্।
> অস্যাস্ত্বামষ্টমো গর্ভো হন্তা যাং বহসেহবুধ ॥
>
> শ্রীমদ্ভাগবতম্, দশম স্কন্ধ, ১/৩৪[১১]
>
> অর্থাৎ, পথিমধ্যে কংসকে সম্বোধন করে দৈববাণী হলো–হে মূর্খ, তুমি যাঁকে বহন করছো, তাঁর অষ্টম গর্ভের সন্তান তোমাকে হত্যা করবে।

একথা শুনে কংস দেবকীকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু বসুদেব বললেন যে, দেবকীকে আপনি বধ করবেন না। তাঁর গর্ভে যে সব সন্তান উৎপন্ন হবে সবই আপনার হাতে তুলে দেব। এ কথা শুনে কংস দেবকীকে হত্যা না করে বসুদেব ও দেবকীকে কারাগারে আটক করে রাখলেন। কারাগারে থাকা অবস্থায় দেবকী ও বসুদেবের পরপর ছয়টি সন্তানকে কংস হত্যা করেন। আর সপ্তম সন্তানকে দেবকীর গর্ভ থেকে প্রতিস্থাপন করা হয় গোকুলে বসুদেবের দ্বিতীয় স্ত্রী রোহিণীর গর্ভে। তাঁর নাম রাখা হয় বলরাম। ভাদ্রমাসের অষ্টমী তিথিতে দেবকীর গর্ভে অষ্টম পুত্র সন্তানের জন্ম হয়, তাঁর নাম রাখা হয় কৃষ্ণ। বসুদেব কারাগার হতে বের হয়ে কৃষ্ণকে গোকুলে নন্দের স্ত্রী যশোদার ঘরে রেখে আসেন। ঐদিন যশোদার ঘরে যোগমায়া রূপে জন্মগ্রহণ করেন দেবী মহাশক্তি। বসুদেব কন্যা যোগমায়াকে নিয়ে কারাগৃহে ফিরে আসেন। যোগমায়ার প্রভাবে কারারক্ষীরা ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলেন, ফলে এই সন্তান পরিবর্তনে কোনো সমস্যা হয়নি। পরদিন কংস কন্যাকে দেবকীর নিকট থেকে জোর করে কেড়ে নিয়ে আসলেন। কংস সদ্যোজাত কন্যাকে পাথরে নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু যোগমায়া আকাশে অদৃশ্য হয়ে যান এবং বলেন হে কংস, তোমাকে যে হত্যা করবে সে গোকুলে বড় হচ্ছে। পরবর্তী সময়ে কংস শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। পূতনারাক্ষসীসহ অনেক চর পাঠান কৃষ্ণকে হত্যার জন্য। কিন্তু কৃষ্ণ সকল চরকে হত্যা করেন। তারপর এক মল্লযুদ্ধের মাধ্যমে কৃষ্ণ তাঁর অত্যাচারী মামা কংসকে হত্যা করেন।

কংস ছিলেন কৃষ্ণের আপন মামা। মামা হয়ে বোন দেবকীর পরপর ছয়টি পুত্র সন্তানকে হত্যা করেছেন। কৃষ্ণকে হত্যারও অনেক চেষ্টা করেছেন। একজন মামা কত নিষ্ঠুর হতে পারে তা কংস-শ্রীকৃষ্ণের কাহিনি পড়লে বোঝা যায়। কংস যে আচরণ করেছে সেটা কোনো ক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের সমাজে এরকম নির্দয় ও নির্মম আত্মীয় অনেক দেখা যায়। যারা নিজেদের স্বার্থে নিকট আত্মীয়দের সাথে জঘন্য আচরণ করে থাকেন। এ রকম আত্মীয়দের আমরা 'কংস মামা' হিসেবে অভিহিত করি। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মামা কংসের জঘন্য আচরণের জন্যই কংস ইতিহাসে ঘৃণ্য ব্যক্তি।

ঘরের শত্রু বিভীষণ–এটি একটি জনপ্রিয় বাগ্‌ধারা। নিজের কাছের মানুষের মাধ্যমে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা বোঝাতে 'ঘরের শত্রু বিভীষণ' বাগ্‌ধারাটির ব্যবহার হয়।

বাল্মিকী রচিত মহাকাব্য রামায়ণে বিভীষণ ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। তিনি ছিলেন রাবণের ছোট ভাই। লঙ্কার রাজা ছিলেন রাবণ। তিনি রামের পত্নী সীতা দেবীকে বন্দী করেছিলেন। সীতাকে উদ্ধারের জন্য অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র রাম বানর সেনার সাহায্যে লঙ্কায় অভিযান পরিচালনা করেন। বিভীষণ ছিলেন মহৎ মনের অধিকারী এবং ধার্মিক। তিনি ছিলেন সৎ, চরিত্রবান। তিনি রাবণের সীতা হরণের কাজটিকে ঘৃণার চোখে দেখেছেন। তিনি রামের কাছে সীতাকে ফিরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেন। সীতাকে ফিরিয়ে না দিলে লঙ্কার ক্ষয় ক্ষতি সম্পর্কে রাবণকে পূর্বাভাস দেন। তিনি বলেন,

বিনশ্যেদ্ধি পুরী লঙ্কা শূরাঃ সর্বে চ রাক্ষসাঃ।
রামস্য দয়িতা পত্নী ন স্বয়ং যদি দীয়তে ॥
প্রসাদয়ে ত্বাং বন্ধুতাৎ কুরুষ্ব বচনং মম।
হিতং তথ্যং ত্বহং ব্রূমি দীয়তামস্য মৈথিলী ॥
রামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ড, ৯/১৯-২০[১৯]

অর্থাৎ, আপনি যদি রামের স্ত্রী সীতাদেবীকে ফিরিয়ে না দেন, তাহলে লঙ্কা নগরী বিনষ্ট হয়ে যাবে। রাক্ষসেরা সব ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি সব সময় আপনার শুভকামনা করি, আমার প্রতি প্রসন্ন হন। আপনাকে আমি কল্যাণকর কথা বলছি। আমার কথা শুনুন এবং সীতাকে আপনি রামচন্দ্রের কাছে ফিরিয়ে দিন।

বিভীষণের কথাগুলি ছিল যুক্তিযুক্ত ও কল্যাণকর। কিন্তু রাবণ বিভীষণের কথা শুনলেন না। বরং বিভীষণকে উদ্দেশ করে কটূক্তি করে বললেন,

নাগ্নির্নান্যানি শস্ত্রাণি ন নঃ পাশা ভয়াবহাঃ।
ঘোরাঃ স্বার্থপ্রযুক্তাস্তু জ্ঞাতয়ো নো ভয়াবহাঃ ॥
রামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ড, ১৬/৭[২০]

অর্থাৎ, আগুন বা অস্ত্রশস্ত্র আমাদের কাছে ভয়ের কারণ নয়, এমনকি ভীষণ পাশাও ভয়ের কারণ নয়। স্বার্থান্ধ আত্মীয়স্বজনই আমাদের ভয়ের কারণ।

তখন বিভীষণ রাবণের পক্ষ ত্যাগ করে রামের পক্ষে যোগদান করলেন এবং রাজ্যের নানারকম গোপন তথ্যাদি ফাঁস করে দিলেন। রাম রাক্ষসদের শক্তি সম্পর্কে বিভীষণের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,

আখ্যাহি মম তত্ত্বেন রাক্ষসানাং বলাবলম্ ॥
রামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ড, ১৯/৭[২১]

অর্থাৎ, রাক্ষসদের শক্তি কেমন সে সম্পর্কে আমাকে বলুন।

বিভীষণ লঙ্কায় রাবণের সৈন্য সংখ্যা, কুম্ভকর্ণের শক্তি, ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ কৌশল প্রভৃতি সম্পর্কে রামকে অভিহিত করেছিলেন। তারপর রাম ও রাবণের যুদ্ধ হলে রাবণ পরাজয় বরণ করেন এবং নিহত হন।

প্রকৃতপক্ষে বিভীষণ সত্যের পথে, ধর্মের পথে থাকলেও নিজের পরিবারের সাথে শত্রুর মতো আচরণ করেছিলেন। বর্তমান সমাজে আত্মীয়-স্বজন কিংবা কাছের মানুষের থেকে শত্রুতামূলক কোনো ব্যবহার পেলে আমরা বলি ঘরের শত্রু বিভীষণ। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও আমরা দেখি নিজের দলের কেউ অন্য দলের হয়ে কাজ করলে বা নিজ দলের গোপন তথ্যাদি বিপক্ষ দলের হাতে তুলে দিলে তখন আমরা তাকে ঘরের শত্রু বিভীষণ বলে আখ্যায়িত করি।

দাতা কর্ণ–'দাতা কর্ণ' এ বাগ্‌ধারাটি অনেক দানশীল ব্যক্তিকে বোঝায়। কর্ণ মহাভারতের একজন বিখ্যাত বীর হিসেবে পরিচিত। মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু দুই ভাই। পাণ্ডুর দুই স্ত্রী ছিল কুন্তী ও মাদ্রী। কুন্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন পঞ্চপাণ্ডব-এর তিন পাণ্ডব যুধিষ্ঠির, ভীম ও

অর্জুন। কর্ণ ছিলেন কুন্তীর সন্তান। কর্ণ কুন্তীর কুমারী অবস্থায় সূর্যের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের সময় কর্ণের কানে ও গলায় ছিল 'কবচ-কুণ্ডল'। এ কবচ-কুণ্ডলের কারণে তিনি ছিলেন অপরাজেয়। কলঙ্কের ভয়ে কুন্তী কর্ণকে একটি পাত্রে রেখে জলে ভাসিয়ে দেন। সূতবংশের এক দম্পতী কর্ণকে পাত্র থেকে তুলে নিয়ে লালন-পালন করেন। অতএব কর্ণ ছিলেন পাণ্ডবদের বড় ভাই। যদিও কর্ণ এসব ব্যাপার জানতেন না। তবে পাণ্ডবদের বড় ভাই হলেও কর্ণ ছিলেন দুর্যোধনের বন্ধু। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি নিজ ভাই পাণ্ডবদের পক্ষ না নিয়ে কৌরবদের পক্ষ নিয়েছিলেন। কৌরবদের প্রধান দুর্যোধন একবার বৈষ্ণব যজ্ঞ সম্পন্ন করেছিলেন। সেই যজ্ঞশেষে কর্ণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, অর্জুনকে হত্যা না করা পর্যন্ত তিনি অন্যের দ্বারা পাদপ্রক্ষালন করাবেন না।

তমব্রবীত্তদা কর্ণঃ শৃণু মে রাজকুঞ্জরঃ!
পাদৌ না ধাবয়ে তাবদ্‌যাবন্ন নিহতেঽর্জুনঃ ॥
কীলালজং ন খাদেয়ং চরিষ্যে চাসুরব্রতম্।
নাস্তীতি নৈব বক্ষ্যামি যাচিতো যেন কেনচিৎ ॥

মহাভারত, বনপর্ব, ২১২/১৫-১৬[৯]

অর্থাৎ, কর্ণ বললেন – রাজশ্রেষ্ঠ! আমার কথা শোনো, যে পর্যন্ত অর্জুনকে হত্যা না করা হবে, সে পর্যন্ত আমি অন্য লোক দ্বারা পাদদ্বয় ধৌত করাবো না। এবং মাংস খাবো না, মদ পান করবো না, আর যে কোনো ব্যক্তি যে প্রার্থনা করুন না কেন তাকে তাই দেব।

এ ব্রত পালনকালে কর্ণের দানের ব্যাপারে যাচাই করতে ইন্দ্র এসেছিলেন। তিনি ছিলেন অর্জুনের শুভাকাঙ্ক্ষী। তিনি ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে এসেছিলেন। তিনি কর্ণের কবচ ও কুণ্ডল চেয়েছিলেন। অবশ্য পূর্বে পিতা সূর্য কর্ণকে সতর্ক করে বলেছিলেন যে, দেবরাজ ইন্দ্র পাণ্ডবদের মঙ্গলের জন্য তোমার কবচ ও কুণ্ডল হরণ করার ইচ্ছায় তোমার নিকট আসবেন। কিন্তু তুমি এটি দিওনা। তিনি বলেছিলেন,

তস্মৈ প্রযাচমানায় ন দেয়ে কুণ্ডলে ত্বয়া।
অনুনেয়ঃ পরং শক্ত্যা শ্রেয় এতদ্ধি তে পরম্ ॥

মহাভারত, বনপর্ব, ২৫৪/১৩[১০]

অর্থাৎ তিনি (ইন্দ্র) এসে তোমার কাছে কবচ ও কুণ্ডল চাইলে তুমি দিওনা, তুমি শক্তি অনুসারে তাঁর বিশেষ অনুনয় করিও, এতেই তোমার মঙ্গল হবে।

কিন্তু কর্ণ ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যেহেতু তিনি বলেছিলেন ব্রতকালীন সময়ে যে যা চাইবে তাকে তাই দেবেন। তাই ইন্দ্র কবচ ও কুণ্ডল চাইলে তিনি তা দিয়েছিলেন। মহাভারতে উল্লেখ আছে–

ততশ্ছিত্ত্বা কবচং দিব্যমঙ্গাত্তথৈবার্দ্রং প্রদদৌ বাসবায়।
তথোৎকৃত্য প্রদদৌ কুণ্ডলে তে কর্ণাত্তস্মাৎ কর্মণা তেন কর্ণঃ ॥

মহাভারত, বনপর্ব ২৬৪/৩৬[১১]

অর্থাৎ, সূতপুত্র নিজ শরীর হতে ছেদন করে দিব্য কবচটি আর্দ্র অবস্থায় ইন্দ্রকে দিলেন এবং কর্ণযুগল হতে ছেদন করে কুণ্ডল দুটিও তাঁকে দান করলেন।

অতএব, দেখা যাচ্ছে কর্ণ প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে নিজের শরীর কেটে রক্ষা কবচ দান করেছিলেন ইন্দ্রকে। নিজের নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও তিনি সত্য রক্ষার থেকে পিছপা হননি। সেজন্য সমাজে যারা দান করেন, সমাজের মঙ্গলের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেন, এ ধরনের মানুষদেরকে আমরা বলি 'দাতা কর্ণ'। তবে দাতা কর্ণ এ বাগ্‌ধারাটি অনেক সময় ব্যঙ্গ করেও বলা হয়ে থাকে। সমাজে যখন কেউ নিজেকে একেবারে বিসর্জন দিয়ে অন্যদের সাহায্য করেন বা অনেক দান করেন তখন তাকে ব্যঙ্গ করে 'দাতা কর্ণ' বলা হয়।

দক্ষযজ্ঞ–'দক্ষযজ্ঞ' এ বাগ্‌ধারাটির অর্থ চরম গণ্ডগোল বা যে কোনো কর্মযজ্ঞে খুব খারাপ অবস্থা। পুরাণ অনুসারে দক্ষযজ্ঞ খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। দক্ষ হলেন ব্রহ্মার পুত্র। দক্ষের কন্যা ছিলেন সতী এবং জামাতা শিব। একদা দক্ষ এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করেন। তিনি ঐ যজ্ঞে সমস্ত দেব-দেবীকে নিমন্ত্রণ দিয়েছিলেন, তাঁর নিমন্ত্রণ পেয়ে বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, দধীচি, বামদেবসহ বহু মুনিঋষি উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি নিজ কন্যা সতী ও জামাতা শিবকে নিমন্ত্রণ দেননি। তিনি জামাতা শিবকে মোটেই পছন্দ করতেন না। শিব ভূত, প্রেত নিয়ে থাকতেন, এছাড়া আরও অনেক কারণে দক্ষ জামাতা শিবকে এ যজ্ঞে নিমন্ত্রণ জানাননি। কিন্তু নিমন্ত্রণ না পেয়েও সতী সেই যজ্ঞে হাজির হয়েছিলেন। তখন রাজা দক্ষ কন্যা সতীকে যজ্ঞে আগত অতিথিবৃন্দের সামনে অপমান করেন এবং তার স্বামী শিব সম্বন্ধে নানা রকম কটূক্তি করেন। সতী স্বামী শিবকে খুব ভালোবাসতেন। স্বামীকে নিয়ে কটূক্তি করায় সতী নিজেকে অপমানিত মনে করেন এবং আত্মবিসর্জন দেন। সতীর আত্মাহুতির খবর শুনে শিব ব্যাপক ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে দক্ষের যজ্ঞের স্থানে প্রবেশ করলেন এবং সবকিছু তছনছ করে ফেললেন। পুরাণে আছে,

আধাবন্তি প্রধাবন্তি বায়ুবেগা মনোজবাঃ।
চূর্ণ্যন্তে যজ্ঞপাত্রাণি যাগস্যায়তানি চ ॥
শীর্য্যমাণানি দৃশ্যন্তে তারা ইব নভস্তলাৎ।
দিব্যান্নপানভক্ষ্যাণাং রাশয়ঃ পর্বতোপমাঃ॥
ক্ষীরনদ্যস্তথা চান্যা ঘৃতপায়সকর্দ্দমাঃ।
মধুমণ্ডোদকা দিব্যাঃ খণ্ডশর্করবালুকাঃ ॥
ষড়রসান্নিবহন্ত্যন্যা গুড়কুল্যা মনোরমাঃ।
উচ্চাবচানি মাংসানি ভক্ষ্যাণি বিবিধানি চ ॥
পানকানি চ দিব্যানি লেহ্যং চোষ্যং তথাপরে।
ভুঞ্জতে বিবিধৈর্বক্ত্রৈর্বিলুণ্ঠন্তি ক্ষিপন্তি চ ॥

বায়ুপুরাণ, ৩০/ ১৪৯-১৫৩[৯৮]

অর্থাৎ, তারা দলে দলে বায়ুর বেগে দৌড়াতে এবং আস্ফালন করতে লাগলো। সব যজ্ঞের পাত্র ধ্বংস করে ফেললো, যজ্ঞের ঘর নষ্ট করলো। আকাশে যেমন তারা অতিশীর্ণ দেখায়, তেমনি যজ্ঞস্থল অতিশীর্ণ হয়ে উঠল। তারা দিব্য পর্বতসমান অন্ন ও পানীয়-রাশি, ক্ষীর, ঘি, পায়স, মধু ও মণ্ডোদক, জল, খণ্ড ও শর্করারূপ বালুকারাশি, ষড়রসবাহিনী অসংখ্য গুড়কুল্যা, অসমান মাংসের স্তূপ এবং অন্যান্য নানারকম ভক্ষ্য, লেহ্য, চুষ্য প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রী পর্যাপ্ত পরিমাণে খেলেন এবং চারদিক ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

পুরাণ আলোচনা করলেই দেখা যায়, দক্ষের বিশাল আয়োজন শিব তাঁর বাহিনী নিয়ে পুরোপুরি লণ্ডভণ্ড করে ফেলেছিলেন। আমাদের সমাজে তেমনি কোনো বিশাল আয়োজন যখন সঠিকভাবে সম্পাদন করতে গিয়ে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়, কিংবা বিশাল গণ্ডগোল তৈরি হয়, যার পরিপ্রেক্ষিতে অনুষ্ঠানটি পুরোপুরি তছনছ হয়ে যায়। তখন আমরা এ ধরনের ঘটনাকে 'দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার' বলে অভিহিত করি।

ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির–এ বাগ্‌ধারাটির অর্থ অত্যন্ত ধার্মিক। যুধিষ্ঠির মহাভারতের একটি অন্যতম চরিত্র। তিনি ছিলেন পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে সবার বড়। তাঁর মায়ের নাম কুন্তী ও পিতার নাম ধর্মরাজ। যুধিষ্ঠিরের জন্ম নিয়ে এক কাহিনি আছে। একবার কুন্তী মহর্ষি দুর্বাসাকে পরিচর্যায় সন্তুষ্ট করেন। দুর্বাসা তাঁকে একটি মন্ত্র শিখিয়ে দেন এবং বলেন এ মন্ত্রের প্রভাবে কুন্তী যে দেবতাকে স্মরণ করবেন সেই দেবতা তার নিকট এসে মিলিত হবেন এবং কুন্তী পুত্র সন্তানের জননী হবেন। পরে কুন্তীর সাথে পাণ্ডুর বিয়ে হয় কিন্তু পাণ্ডু সন্তান উৎপাদনে অক্ষম ছিলেন।

তাই কুন্তী পাণ্ডুর পরামর্শে ধর্মকে আহ্বান করেন। ধর্মের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠির জন্মগ্রহণ করেন। কুন্তীর প্রসবকালে দৈববাণীতে বলা হয়েছে,

এষ ধর্মভৃতাং শ্রেষ্ঠো ভবিষ্যতি নরোত্তমঃ।
বিক্রান্তঃ সত্যবাক্ চৈব রাজা পৃথ্ব্যাং ভবিষ্যতি ॥
যুধিষ্ঠির ইতি খ্যাতঃ পাণ্ডোঃ প্রথমজঃ সুতঃ।
ভবিতা প্রথিতো রাজা ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ ॥
মহাভারত, আদিপর্ব, ১১৭/১০-১১[১৯]

অর্থাৎ, এ ছেলেটি ধার্মিকদের মধ্যে সেরা, মানুষের মধ্যে প্রধান, তেজশালী, সত্যবাদী এবং পৃথিবীর রাজা হবে। পাণ্ডুর এ প্রথম ছেলের নাম যুধিষ্ঠির হবে। সে ত্রিলোকের বিখ্যাত রাজা হবে।

প্রকৃতপক্ষে দৈববাণী অনুসারে যুধিষ্ঠির ছিলেন ধার্মিক, ক্ষমাবান, সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত। ধর্মের ঔরসে জন্ম বলে যুধিষ্ঠিরকে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির বলা হয়। তিনি মহাভারতের প্রধান পুরুষ ও নায়ক। মহাভারতে আমরা দেখি কপট পাশা খেলায় যুধিষ্ঠির পরাজিত হলেন। শর্ত ছিল যারা খেলার পরাজিত হবেন তাঁদের বার বছর বনে বাস করতে হবে আর এক বছর থাকতে হবে অজ্ঞাতবাসে। শর্তানুসারে পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীকে নিয়ে বনবাসী হলেন। বনবাসকালে দ্রৌপদী ও ভীম যুধিষ্ঠিরকে অনেক কটূক্তি করেন। দ্রৌপদী ও ভীম বিভিন্ন কথার দ্বারা ধর্মপুত্রকে উত্তেজিত করে তোলার চেষ্টা করেন। ভীম শর্ত ভঙ্গ করে যুদ্ধের প্রস্তুতির কথা বলেন। ভীমের কথা থেকে বোঝা যায়, রাজনীতিতে এসব শর্তের কোনো মূল্য নেই। এ জগতে ধর্ম, কোমলতা, দয়া, সরলতা দ্বারা কখনও সম্পদ অর্জন হয় না। ক্ষমতা দখল করতে গেলে শঠতাই অন্যতম পথ। ভীম বলেন–

ন হি কেবলধর্ম্মাত্মা পৃথিবীং জাতু কশ্চন।
পার্থিবো ব্যজয়দ্রাজন্! ন ভূতিং ন পুনঃ শ্রিয়ম্ ॥
জিহ্বাং দত্ত্বা বহূনাং হি ক্ষুদ্রাণাং লুব্ধচেতসাম্।
নিকৃত্যা লভতে রাজ্যমাহারমিব শল্যকঃ ॥
মহাভারত, বনপর্ব, ২৯/৫৮-৫৯[২০]

অর্থাৎ, কোনো রাজা কখনো শুধুমাত্র ধর্মকে কেন্দ্র করে দেশ, সম্পদ ও রাজলক্ষ্মীকে জয় করতে পারেননি। শজারু যেমন মধুমক্ষিকাগণের বসবার জন্য নিজ জিহ্বাটাকে বের করে দেয় এবং পরে শঠতা করে সেই মধুমক্ষিকাকে খেয়ে ফেলে, রাজাও তেমনি প্রথমে জিহ্বা দ্বারা কোনো শপথ নিয়ে পরে শঠতা করে বহু ক্ষুদ্র লোকের রাজ্য দখল করে থাকেন।

কিন্তু যুধিষ্ঠির ধীর, স্থিরভাবে সব কথা শোনেন এবং প্রত্যুত্তর দেন। তিনি শর্ত পালন করায় দৃঢ় ছিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁর ধর্ম থেকে মোটেই বিচ্যুত হননি। ক্রুদ্ধ দ্রৌপদীর বক্তব্য থেকে জানা যায়, যুধিষ্ঠির সত্য বা ধর্ম রক্ষার স্বার্থে সব কিছু পরিত্যাগ করতে পারেন। দ্রৌপদী বলেন,

ভীমসেনার্জ্জুনৌ চেমৌ মাদ্রেয়ৌ চ ময়া সহ।
ত্যজেস্ত্বমিতি মে বুদ্ধির্ন তু ধর্ম্মং পরিত্যজেঃ ॥ মহাভারত, বনপর্ব, ২৬/৭[২১]

অর্থাৎ, আমি মনে করি যে, আমার সাথে ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবকে আপনি ত্যাগ করতে পারেন। কিন্তু ধর্মকে নয়।

তবে একবার একটু কৌশলে মিথ্যা কথা বলতে হয়েছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের এক পর্যায়ে পাণ্ডবরা দেখলেন দ্রোণাচার্যের পতন না ঘটলে যুদ্ধে জয় লাভ সম্ভব নয়। তখন তাঁকে বধ করার জন্য ছলনার আশ্রয় নিতে হয়। কৃষ্ণ বললেন, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার মৃত্যু সংবাদ যদি তাঁকে শোনানো যায় তবেই তিনি যুদ্ধ করবেন না। তারপর অশ্বত্থামার মৃত্যু সংবাদ তাঁকে

শোনালে তিনি বিশ্বাস করেননি। দ্রোণ বলেছিলেন যদি যুধিষ্ঠির বলেন তাহলে তিনি বিশ্বাস করবেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুধিষ্ঠির তখন উচ্চস্বরে বলেছিলেন,

> অশ্বত্থামা হত ইতি শব্দমুচ্চৈশ্চকার হ।
> অব্যক্তমব্রবীদ্রাজন্! হতঃ কুঞ্জর ইত্যুত ॥
> মহাভারত, দ্রোণপর্ব, ১৬৪/৪৫[১১]
>
> অর্থাৎ, তাই উচ্চস্বরে বললেন যে, অশ্বত্থামা হত আর আস্তে বললেন অশ্বত্থামা নামে এক হাতি মারা গেছে।

প্রকৃতপক্ষে অশ্বত্থামা নামে একটি হাতি মারা গিয়েছিল। যুধিষ্ঠির সত্যবাদিতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য মৃদুস্বরে বলেছিলেন ইতি গজ। যুধিষ্ঠিরের মুখে অশ্বত্থামার মৃত্যু সংবাদ শুনে দ্রোণ অস্ত্র ত্যাগ করেন এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের হাতে নিহত হন। এখানে দেখা যাচ্ছে যুধিষ্ঠিরের সত্যবাদিতার প্রতি গুরু দ্রোণের অগাধ বিশ্বাস ছিল।

প্রকৃতপক্ষে যুধিষ্ঠির ছিলেন এক আদর্শ চরিত্রের অধিকারী। তিনি ছিলেন সদাচারী, ধৈর্যশীল ও সত্যবাদী। মিথ্যা কথা বলা ছিল তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। গভীর সংকটে পড়েও তিনি সত্য বা ধর্ম ত্যাগ করেননি। মহাভারতে এরকম বহু উদাহরণ পরিলক্ষিত হয়। আমাদের সমাজে কেউ যদি সত্যবাদী, দয়াবান, ত্যাগী অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের সাথে মিলে যায় তাহলে আমরা তাকে সত্যবাদী যুধিষ্ঠির বলি। যদিও সমাজে এরকম লোক নেই বললেই চলে। তাই কোনো ঘটনায় কেউ যদি সত্যকথা, স্পষ্ট কথা বলে তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যঙ্গার্থে এই বাগ্‌ধারাটি ব্যবহৃত হয়।

পঞ্চপাণ্ডব–বিখ্যাত সংস্কৃত মহাকাব্য 'মহাভারত' থেকে আমরা 'পঞ্চপাণ্ডব' এর কথা জানতে পারি। মহাভারতে বর্ণিত পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র হলেন যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব। পাণ্ডুর পুত্র বলে এদের পাণ্ডব বলা হয়, আর পাঁচ জন বলে এঁদের পঞ্চপাণ্ডব বলা হয়। এ পাঁচ ভাই ছিলেন একই রকম চিন্তা চেতনায় বিশ্বাসী। 'পঞ্চপাণ্ডব' বাগ্‌ধারাটিও একই চিন্তা চেতনায় বিশ্বাসী পাঁচ বন্ধু বা ভাইদের বোঝায়।

পাণ্ডুর ছিল দুই স্ত্রী, কুন্তী ও মাদ্রী। যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন কুন্তীর সন্তান আর নকুল ও সহদেব মাদ্রীর সন্তান। এ পাঁচ ভাই পাণ্ডুর ঔরসজাত নয়। ধর্মের ঔরসে যুধিষ্ঠির, পবনের ঔরসে ভীম, ইন্দ্রের ঔরসে অর্জুন আর অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের ঔরসে নকুল ও সহদেবের জন্ম। এ পাঁচভাই মহাভারতের কেন্দ্রবিন্দু। কুরুক্ষেত্রের প্রাঙ্গণে কৌরবদের বিরুদ্ধে তাঁরা যুদ্ধ করেছিলেন। কৌরবরা ছিলেন তাঁদের জ্যাঠাতো ভাই। মূলত এ লড়াই ছিল ক্ষমতায় থাকার লড়াই। সিংহাসন দখলই ছিল এ ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধের উদ্দেশ্য। কৌরবদের নেতৃত্বে ছিলেন দুর্যোধন, পিতামহ ভীষ্ম এবং অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য আর পাণ্ডবদের পক্ষে ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। আঠার দিনব্যাপী এ যুদ্ধ হয়েছিল। এ যুদ্ধে দুই পক্ষের অসংখ্য সৈন্য মারা গিয়েছিল। পাণ্ডবরা এ যুদ্ধে জয়লাভ করে হস্তিনাপুরের সিংহাসন অধিকার করেন। পাণ্ডবরা ছিলেন কষ্টসহিষ্ণু ও স্থিরবুদ্ধি সম্পন্ন। ধর্ম-কর্ম, জ্ঞান-বুদ্ধি, যুদ্ধবিদ্যা প্রভৃতিতে তাঁরা ছিলেন পারদর্শী। এ পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কও ছিল অসাধারণ। তাঁদের একে অপরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসা ছিল।

আমাদের সমাজে পাঁচ ভাই বা সমবয়সী পাঁচ বন্ধুর মধ্যে চলনে-বলনে, চিন্তা-চেতনায়, জ্ঞান-বুদ্ধিতে, শিক্ষা-দীক্ষার যদি একই রকম দেখি তখন আমরা মহাভারতের পঞ্চপাণ্ডবদের স্মরণ করে তাদের পঞ্চপাণ্ডব বলে থাকি।

আধুনিক বাংলাসাহিত্যে অমীয় চক্রবর্তী, জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে এই পাঁচজন কবিকে পঞ্চপাণ্ডব বলা হয়। এঁরা ছিলেন ত্রিশের দশকের কবি। রবীন্দ্র

প্রভাবের বাইরে এ পঞ্চপাণ্ডব বাংলা ভাষায় আধুনিক কবিতার সৃষ্টি করেছিলেন। ফলে দেখা যায় পঞ্চপাণ্ডব বাংলাভাষায় বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ। এটি খুবই জনপ্রিয় একটি বাগ্‌ধারা।

ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা–'ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা' এ বাগ্‌ধারাটির অর্থ হলো ভীষণ প্রতিজ্ঞা। ভীষ্ম বিখ্যাত মহাকাব্য মহাভারতের অন্যতম চরিত্র। তিনি ছিলেন কুরু বংশের রাজা শান্তনু এবং গঙ্গা দেবীর পুত্র। তাঁর প্রকৃত নাম দেবব্রত। গঙ্গার পুত্র বলে তিনি গাঙ্গেয় নামেও পরিচিত। তিনি পাণ্ডব ও কৌরবদের পিতামহ। দেবব্রত ভীষণ প্রতিজ্ঞা করার জন্য ভীষ্ম নামে পরিচিত হন। তাঁর এ প্রতিজ্ঞার পিছনে একটি কাহিনি আছে। একদিন ভীষ্মের পিতা রাজা শান্তনু যমুনাতীরে ভ্রমণ করতে গিয়ে ধীবর রাজকন্যা সত্যবতীকে দেখেন এবং তাঁর রূপে মুগ্ধ হন। তিনি সত্যবতীকে বিবাহের জন্য ধীবররাজের কাছে প্রস্তাব দিলেন। ধীবররাজ দেখলেন শান্তনুর পুত্র দেবব্রত পরবর্তীসময়ে রাজা হবেন। তাই তার কন্যা সত্যবতীর পুত্রের কোনো দিন রাজা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, এজন্য তিনি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বললেন, যদি সত্যবতীর পুত্রকে রাজা করা হয় তবেই তিনি এ বিবাহে রাজি আছেন।

রাজা শান্তনুর পক্ষে এ শর্ত মানা অসম্ভব ছিল। কারণ নিয়ম অনুসারে দেবব্রতই হবে পরবর্তী রাজা। তাই শান্তনু খুবই চিন্তিত মনে রাজ্যে ফিরে আসলেন। পিতা শান্তনুকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখে দেবব্রত ধীরে ধীরে প্রকৃত কারণ জানতে পারেন। তখন তিনি ধীবররাজের কাছে গিয়ে পিতার জন্য কন্যা প্রার্থনা করলেন এবং বললেন, তিনি কখনও রাজা হবেন না। কিন্তু খুবই দূরদর্শী ধীবররাজ বললেন যে, দেবব্রতের পরবর্তী প্রজন্মতো সিংহাসনের দাবি করতে পারেন। ধীবররাজ বলেন–

> নান্যথা তন্মহাবাহো! সংশয়োঽত্র ন কশ্চন।
> তবাপত্যং ভবেদ্‌যত্তু তত্র নঃ সংশয়ো মহান্ ॥
>
> মহাভারত, আদিপর্ব ৯৪/৯২[১৩]

> অর্থাৎ হে বীর! আপনার এ প্রতিজ্ঞা কখনও মিথ্যা হতে পারে না। অতএব, এ বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু আপনার যে পুত্র হবে, তার উপরেই আমার খুব সন্দেহ রয়েছে।

তখন ভীষ্ম বললেন,

> অদ্য প্রভৃতি মে দাস! ব্রহ্মচর্য্যং ভবিষ্যতি।
>
> মহাভারত, আদিপর্ব ৯৪/ ৯৬[১৪]

> অর্থাৎ, হে দাসরাজ! আজ থেকে আমার ব্রহ্মচর্য ব্রত হবে।

দেবব্রতর এ ভীষণ প্রতিজ্ঞার জন্য তাঁর নাম হলো ভীষ্ম। ভীষ্মের এ প্রতিজ্ঞার জন্য শান্তনু সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে ইচ্ছামৃত্যু বর দিলেন। ভীষ্ম আজীবন ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করেছেন। তিনি প্রতিজ্ঞা থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হননি। রাজা শান্তনুর ঔরসে সতবতীর গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য নামে দুই ছেলের জন্ম হয়। শান্তনুর মৃত্যুর পর ভীষ্ম নিজেই চিত্রাঙ্গদকে সিংহাসনে বসান, কিছুদিন পর চিত্রাঙ্গদ মারা যায়। তখন বিচিত্রবীর্যকে ভীষ্ম সিংহাসনে বসান। ভীষ্ম বিচিত্রবীর্যকে কাশীরাজের দুই মেয়ে অম্বিকা ও অম্বালিকার সাথে বিয়ে দেন। কিছুদিন পর বিচিত্রবীর্যের অকালমৃত্যু হয়। তাঁর কোনো সন্তান ছিল না। তখন সত্যবতী ভীষ্মকে বংশ রক্ষার জন্য অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে সন্তান উৎপাদনের কথা বলেন। বংশ রক্ষার জন্যও ভীষ্ম তাঁর প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গতে রাজি হলেন না। তিনি বলেন,

> পরিত্যজেয়ং ত্রৈলোক্যং রাজ্যং দেবেষু বা পুনঃ।
> যদ্বাপ্যধিকমেতাভ্যাং ন তু সত্যং কথঞ্চন ॥
>
> মহাভারত, আদিপর্ব, ৯৭/১৬[১৫]

> অর্থাৎ, আমি ত্রিভুবন ত্যাগ করতে পারি, কিংবা দেবগণের রাজত্ব পরিত্যাগ করতে পারি, অথবা এ দুইটা হতে যদি বেশি কিছু থাকে, তাও ত্যাগ করতে পারি। কিন্তু কোনো প্রকারে সত্য পরিত্যাগ করতে পারি না।

এভাবেই ভীষ্ম আমরণ তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছেন। আমাদের সমাজেও কোনো কাজের জন্য কেউ যদি ভীষণ প্রতিজ্ঞা করেন, একনিষ্ঠ হয়ে কাজ করেন এবং সেই প্রতিজ্ঞা থেকে যদি তিনি একবিন্দুও না নড়েন, তখন আমরা সেই ব্যক্তিকে বলি ও যেন 'ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা' করে বসে আছে।

মান্ধাতার আমল–'মান্ধাতার আমল' এ বাগ্‌ধারাটি মানুষের মুখে মুখে জনপ্রিয় শব্দগুচ্ছ। বহু দিনের পুরানো কিছু বোঝাতে এ বাগ্‌ধারাটি ব্যবহৃত হয়। মান্ধাতার আমল বলতে মান্ধাতার সময় বোঝায়। মান্ধাতা ছিলেন সূর্যবংশীয় রাজা। তাঁর পিতার নাম ছিল যুবনাশ্ব। বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে দেখা যায়, মান্ধাতার জন্ম ইতিহাস অতি চমকপ্রদ। তিনি মাতৃগর্ভে জন্ম গ্রহণ করেননি, তাঁর জন্ম হয়েছিল পিতৃগর্ভে। যুবনাশ্ব ছিলেন অপুত্রক। অনেক চেষ্টার পরও তিনি সন্তান লাভ করতে পারলেন না। শেষে তিনি মুনিদের সাথে আশ্রমে বাস করতেন। সেখানে তিনি মুনিদের তুষ্ট করে পুত্র উৎপাদনের জন্য যজ্ঞ করলেন। সে যজ্ঞ শেষ হলো মধ্যরাতে। তখন মুনিগণ মন্ত্রপূত জল ভর্তি কলস বেদিতে রেখে ঘুমাতে গেলেন। শর্ত ছিল যে, এ কলসীর জল যুবনাশ্বের স্ত্রী পান করলে তিনি গর্ভধারণ করবেন। এ ব্যাপারটি যুবনাশ্ব জানতেন না। রাতে খুব তৃষ্ণা পেলে তিনি সেই মন্ত্রপূত জল পান করলেন। তাতে যুবনাশ্ব গর্ভ ধারণ করলেন। বিষ্ণুপুরাণে আছে,

> "গর্ভশ্চ যুবনাশ্বোদরেঽভবৎ। ক্রমেণ চ ববৃধে।
> প্রাপ্তসময়শ্চ দক্ষিণং কুক্ষিমবনীপতের্নির্ভিদ্য নিশ্চক্রাম
> ন চাসৌ রাজা মমার" ॥ বিষ্ণুপুরাণ, ৪/২/১৭[১৬]
>
> অর্থাৎ, তখন যুবনাশ্ব গর্ভ ধারণ করলেন এবং আস্তে আস্তে গর্ভ বর্ধিত হলো। তারপর যথাসময়ে রাজার দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করে পুত্র জন্মিল কিন্তু রাজা মৃত্যুবরণ করলেন না।

মান্ধাতা যেহেতু মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেননি তাই তিনি মায়ের দুধ পান করতে পারেননি। শিশুটিকে বাঁচিয়ে রাখা তাই বেশ কঠিন হয়েছিল। তখন শিশুটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য দেবরাজ ইন্দ্র বললেন,

> মামেয়ং ধাস্যতীত্যেবং ভাষিতে চৈব বজ্রিণা।
> মান্ধাতেতি চ নামাস্য চক্রুঃ সেন্দ্রা দিবৌকসঃ ॥
> মহাভারত, বনপর্ব, ১০৪/৩০[১৭]
>
> অর্থাৎ, তখন ইন্দ্র সেই বালকটির মুখে নিজের তর্জনী আঙ্গুলী প্রবেশ করালেন এবং বললেন যে, এভাবে আমাকে পান করবে। দেবতারা তখন সেই বালকটির নাম রাখলেন মান্ধাতা।

পরবর্তীকালে মান্ধাতা সিংহাসনে বসে বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়েছিলেন। বিষ্ণুপুরাণে আছে–

> যাবৎ সূর্য্য উদেতি স্ম যাবচ্চ প্রতিতিষ্ঠতি।
> সর্ব্বং তদ্‌যৌবনাশ্বস্য মান্ধাতুঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে ॥ বিষ্ণুপুরাণ ৪/২/১৮[১৮]
>
> অর্থাৎ, সূর্য যেখানে ওঠে এবং অস্ত যায়, তার মধ্যে সমস্ত ভূমিই যুবনাশ্ববংশীয় রাজা মান্ধাতার বলে পরিচিত।

পৌরাণিক কাহিনিতে মান্ধাতার জন্ম ইতিহাস বা সময়ের সত্যতা কতটুকু সেটা নিয়ে সংশয় থাকলেও আমাদের সমাজে বিভিন্ন কথাবার্তায় মান্ধাতার আমল বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। পুরানো কোনো চিন্তা ভাবনা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের কথাবার্তায় উঠে আসলে আমরা প্রায়ই বলে থাকি ঐসব মান্ধাতার আমলের চিন্তা-ভাবনা বাদ দিয়ে নতুন চিন্তা করো।

রাবণের চিতা–'রাবণের চিতা' এ বাগ্‌ধারাটির অর্থ চিরকালের অশান্তি। অর্থাৎ যা কখনো শান্ত হবার নয়। রাবণ ছিলেন রামায়ণের অন্যতম চরিত্র। তিনি ছিলেন লঙ্কার অধিপতি। রাবণের প্রথম স্ত্রীর নাম মন্দোদরী। তিনি মেঘনাদসহ অনেক বীর সন্তানের মা। রামায়ণের কাহিনি অনুসারে রাবণ রামের পত্নী সীতাকে অপহরণ করে লঙ্কায় নিয়ে এসেছিলেন। রাম ছিলেন অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র। পিতৃসত্য রক্ষার জন্য তিনি পত্নী সীতা ও ভাই লক্ষণসহ চৌদ্দবছরের জন্য বনবাসে এসেছিলেন। এ বনবাসে থাকাকালীন রাবণ সীতাকে অপহরণ করেন। তারপর রাম সীতাকে উদ্ধারের জন্য তাঁর বানর বাহিনী নিয়ে রাবণ ও তাঁর সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে (কৃত্তিবাসী-রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ড, বাল্মীকি-রামায়ণে যুদ্ধকাণ্ড) এ যুদ্ধের বিবরণ রয়েছে। এ যুদ্ধে রাবণ পরাজিত হন এবং রামের হাতে তাঁর মৃত্যু হয়। তারপর রাবণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য বিভীষণকে রাম আদেশ করেন। এদিকে রাবণের মৃত্যুতে তাঁর জ্যেষ্ঠাপত্নী মন্দোদরী করুণভাবে বিলাপ করেন। তিনি রামচন্দ্রের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করেন। রামচন্দ্র তাঁকে চিনতে না পেরে আশীর্বাদ করেন 'জন্মায়তী হও' অর্থাৎ, মৃত্যু পর্যন্ত শাঁখা সিঁদুর নিয়ে সধবা থাকো। মন্দোদরী তখন তাঁর পরিচয় দিলেন এবং বললেন যে তাঁর স্বামী রাবণের মৃত্যু হয়েছে। তাহলে কীভাবে তিনি সধবা থাকবেন। ধর্মীয় নিয়ম অনুসারে স্বামীর চিতা যতক্ষণ পর্যন্ত জ্বলতে থাকে ততক্ষণ স্ত্রী সধবা থাকে। কিন্তু রামের আশীর্বাদতো মিথ্যা হতে পারেনা। তাই রাম পুনরায় বললেন,

সত্য মোর কথা, রাবণের চিতা,
জ্বালিয়ে রাখ আয়ত ॥
শুন মন্দোদরী, যাহ নিজ পুরী,
মনে না কর বিলাপ।
মোর হাতে মরে, গেল স্বর্গপুরে,
খণ্ডিল সকল পাপ ॥
শুন মোর বাণী, গৃহে যাও রাণী,
দুঃখ না ভাবিহ চিতে।
রাবণের চিতা, রহিবে সর্বথা,
চিরকাল রবে আয়তে ॥
রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪৮০[১৯]

বাল্মীকির রামায়ণে রাবণের চিতা প্রসঙ্গে কিছু বলা হয়নি কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাবণের চিতার কথা আছে। এটাই বাঙ্গালি মানসে গেঁথে গিয়েছে। এ চিতা চিরকালীন দুঃখের ব্যাপার, রাবণের মতো বীরের পরাজয়ের প্রতিচ্ছবিও। তাই সমাজে বহুদিনের শোকের বা পরাজয়ের স্মৃতি বোঝাতে 'রাবণের চিতা' এ বাগ্‌ধারাটি ব্যবহৃত হয়।

রামরাজ্য–রামরাজ্য এ বাগ্‌ধারাটির অর্থ সুশাসিত এবং সুখশান্তিপূর্ণ রাজ্য। অযোধ্যার রাজা ছিলেন দশরথ। তিনি ছিলেন সূর্যবংশীয় রাজা। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন রাম। রাম ছিলেন বিষ্ণুর অবতার। তিনি ছিলেন রামায়ণের প্রধান চরিত্র। তাঁর স্ত্রীর নাম সীতা। কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্রে রাম পিতৃসত্যরক্ষার্থে সিংহাসনের দাবি ত্যাগ করে চৌদ্দবছর বনবাসে গিয়েছিলেন। রামের সঙ্গে ছিলেন ভাই লক্ষ্মণ ও স্ত্রী সীতা। বনবাসে অবস্থানকালে লঙ্কার রাজা রাবণ

সীতাকে অপহরণ করে লঙ্কায় নিয়ে যান। রাম বানর সেনার সাহায্যে রাবণের বিরাট রাক্ষস বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেন এবং রাবণকে পরাজিত করেন। তারপর রাম সীতাকে উদ্ধার করে ভাই লক্ষ্মণসহ অযোধ্যায় ফিরে আসেন এবং রাজ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রাম রাজা থাকাকালীন নীতি-নিষ্ঠার সাথে রাজ্য শাসন করেন। তিনি ছিলেন প্রজাহিতৈষী শাসক। প্রজাদের চাওয়া-পাওয়াকে তিনি সব সময় প্রাধান্য দিতেন। প্রজাদের কারণে তিনি প্রিয় স্ত্রী সীতা দেবীকে ত্যাগ করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। একজন আদর্শ শাসকের অন্যতম কাজ প্রজাদের ভালোমন্দ দেখাশোনা করা। রাম সমাজে মানুষে মানুষে বৈষম্য দূর করে সর্বত্র ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। এজন্য রামের রাজ্যে মানুষ সুখী জীবন যাপন করতে পারতো। রামায়ণে উল্লেখ আছে–

ন পর্যদেবন্ বিধবা ন চ ব্যালকৃতং ভয়ম্।
ন ব্যাধিজং ভয়ঞ্চাসীদ্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥
নির্দস্যুরভবল্লোকো নানর্থং কশ্চিদস্পৃশৎ।
ন চ স্ম বৃদ্ধা বালানাং প্রেতকার্যাণি কুর্বতে ॥
সর্বং মুদিতমেবাসীৎ সর্বো ধর্মপরোঽভবৎ।
রামমেবানুপশ্যন্তো নাভ্যহিংসন্ পরস্পরম্ ॥

রামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ড, ১২৮/৯৮- ১০০

অর্থাৎ, রাম রাজ্য শাসন করার সময় কেউ বিধবা হওয়ার কষ্ট পায়নি। সর্প প্রভৃতি এবং রোগব্যাধিজনিত ভয় দূর হয়ে গিয়েছিল। রাজ্যে কোনো দস্যু অর্থাৎ চোর-ডাকাত ছিল না, অনর্থ ছিল না। বয়স্কদের বালকের জন্য শ্রাদ্ধ করা লাগতো না অর্থাৎ শিশু মৃত্যু ছিল না। রাজ্যে সব জায়গায় শান্তি বিরাজ করতো। কেউ অধর্ম আচরণ করতো না। সকলেই রামের আদর্শ অনুসরণ করতো এবং সবাই ছিল আদর্শবান।

অতএব, আমরা বলতে পারি রাম ছিলেন একজন আদর্শ নীতিমান শাসক। যার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর রাজ্য হয়ে উঠেছিল একটি স্বর্গীয় রাজ্য। প্রকৃতপক্ষে, রামরাজ্য হলো একটি আদর্শ সমাজ বা রাষ্ট্র যা প্রত্যেক মানুষের কাম্য। আমরা যখন কোনো শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্রের কথা বলি তখন 'রামরাজ্য' এ বাগ্‌ধারাটি বলে থাকি। এ বাগ্‌ধারাটি প্রয়োগ বেশি দেখা যায় রাজনৈতিক দলের বক্তব্যে। বর্তমান ভারতে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই দেশকে রামরাজ্যের মতো শান্তিপ্রিয় ও সমৃদ্ধ দেশ গঠনের অঙ্গীকার করেন। গান্ধীজীও ভারতকে রামরাজ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

লঙ্কাকাণ্ড–'লঙ্কাকাণ্ড' বাগ্‌ধারাটির অর্থ হচ্ছে তুমুল বিবাদ বা যুদ্ধ। এ বাগ্‌ধারাটি এসেছে রামায়ণ থেকে। রামায়ণ সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রাচীন মহাকাব্য। ঋষি বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেন। রামায়ণ সাতটি কাণ্ডে বিভক্ত। লঙ্কাকাণ্ড বা যুদ্ধকাণ্ড তার মধ্যে একটি। রাম রামায়ণের নায়ক। তিনি ছিলেন রাজা দশরথ ও কৌশল্যার জ্যেষ্ঠপুত্র। রাজা দশরথের দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন কৈকেয়ী। তিনি রামের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেন এবং সেই চক্রান্তে রামকে চৌদ্দ বছর বনে যেতে হয়। বনবাসে থাকাকালীন লঙ্কার অধিপতি রাবণ সীতাকে অপহরণ করে লঙ্কায় নিয়ে যান এবং অশোকবনে সীতাকে আটকে রাখেন। সীতাকে উদ্ধারের জন্য রাম বানর সেনার সাহায্য নেন। রাম ও লক্ষ্মণ তাঁর বানর সেনাবাহিনী নিয়ে সমুদ্র পার হয়ে লঙ্কায় প্রবেশ করেন। সেখানে রাম ও রাবণের মধ্যে তীব্র যুদ্ধ হয়। এ লঙ্কাকাণ্ড বা যুদ্ধকাণ্ডে সেই যুদ্ধের পুরোপুরি বিবরণ রয়েছে। যুদ্ধকাণ্ডে আছে,

এবমুক্ত্বা শিতৈর্বাণৈস্তপ্তকাঞ্চনভূষণৈঃ।
আজঘান রণে রামো দশগ্রীবং সমাহিতঃ ॥
তথা প্রদীপ্তৈর্নারাচৈর্মুসলৈশ্চাপি রাবণঃ।
অভ্যবর্ষত্তদা রামং ধারাভিরিব তোয়দঃ ॥

রাম-রাবণমুক্তানামন্যোন্যমভিনিঘ্নতাম্।
বরাণাঞ্চ শরাণাঞ্চ বভূব তুমুলঃ স্বনঃ ॥

রামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ড, ১০০/৫৭-৫৯[৩১]

অর্থাৎ, এই বলে রাম দশানন রাবণকে তপ্তকাঞ্চনভূষিত তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা আঘাত করলেন। মেঘ যেমন বৃষ্টির ধারা বর্ষণ করে রাবণও তেমনি রামের ওপর বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। দুজনের ধনুক থেকে নির্গত বাণের সংঘাতে উৎপন্ন হলো তুমুল শব্দ।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে তুমুল যুদ্ধ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

কোপেতে রাবণ করে বাণ-অবতার।
তিন লক্ষ বাণ মারে সর্পের আকার ॥
সর্প বাণ দেখি রামে লাগিল তরাস।
বুঝি পুনঃ এড়িল বন্ধন নাগপাশ ॥
নাগপাশ নিবারণে জানেন সন্ধান।
মন্ত্রপড়ি শ্রীরাম এড়েন খগ-বাণ ॥
গরুড় হইয়া বাণ আকাশেতে বুলে।
রাবণের সর্প-বাণ ধরে ধরে গিলে ॥

রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪৬০[৩২]

অতএব, লঙ্কাকাণ্ড বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তীব্রযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল উভয়পক্ষের মধ্যে। এ যুদ্ধে উভয় পক্ষের প্রচুর সৈন্য হতাহত হয়েছিল। এ যুদ্ধে রাবণ পক্ষের বিখ্যাত যোদ্ধা কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ, রাবণসহ অনেকে রাম-বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছিলেন। অন্যদিকে হনুমান আগুন লাগিয়ে লঙ্কাপুরীকে দগ্ধ করে দিয়েছিলেন। আমাদের সমাজে আমরা দেখি দুজন ব্যক্তি, পক্ষ, পাড়া বা গ্রামের মধ্যে যখন তুমুল মারামারি বা ঝগড়াঝাটি লেগে যায় কিংবা রাজনৈতিক দুইপক্ষের মধ্যে যখন তীব্র মারামারি হয় তখন আমরা লঙ্কাকাণ্ডে রাম-রাবণের ভীষণ যুদ্ধের সাথে তুলনা করে বলি দুই পক্ষ লঙ্কাকাণ্ড শুরু করেছে।

শকুনি মামা–'শকুনি মামা' এ বাগ্‌ধারাটির অর্থ কুচক্রী লোক। সমাজে অনেক কুটবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকেই সাধারণত শকুনি মামা বলা হয়।

শকুনি বিখ্যাত মহাকাব্য মহাভারতের অন্যতম একটি চরিত্র। তিনি ছিলেন ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রী গান্ধারীর বড় ভাই অর্থাৎ, ধৃতরাষ্ট্রের শ্যালক এবং দুর্যোধনের মামা। গান্ধাররাজ সুবলের পুত্র ছিলেন শকুনি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধূর্ত, কপট এবং নানারকম কুটিলতায় ভরপুর। তিনি মহাভারতের অন্যতম খলনায়ক। নানারকম কূটবুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ার কারণে 'শকুনি মামা' বাগ্‌ধারাটি কুচক্রী লোক হিসেবে আখ্যায়িত হয়। বোন গান্ধারীর সাথে ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহের পর শকুনি কুরু পরিবারেই থাকতেন। ফলে ভাগনে দুর্যোধনের সাথে শকুনির ব্যাপক সখ্যতা তৈরি হয়। তিনি দুর্যোধনকে সবসময় কুপরামর্শ দিতেন এবং অন্যায়কাজে উদ্বুদ্ধ করতেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে কুরু ও পাণ্ডবদের মধ্যে কুরুক্ষেত্রে যে ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হয় তার জন্য শকুনিকে অনেকাংশে দায়ী করা হয়। শকুনি পাণ্ডব ও কৌরবদের মধ্যে অর্থাৎ ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ্ব তৈরির ক্ষেত্রে ইন্ধন না দিলে হয়তো কুরুবংশ বিনাশ হতো না। আদিপর্বে আমরা দেখি মাতা কুন্তীসহ পঞ্চপাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার জন্য বারণাবতে জতুগৃহ নির্মাণ করান দুর্যোধন। জতুগৃহ ছিল দাহ্য পদার্থ দিয়ে তৈরি গৃহ। এ গৃহের বাহিরটা ছিল মাটির আস্তরণে ঢাকা কিন্তু ভিতরটা ছিল ঘি, তেল প্রভৃতি দাহ্য পদার্থ এবং জতু বা গালা দিয়ে তৈরি। এ গৃহ তৈরি করে পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার অন্যতম পরামর্শক ছিলেন শকুনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিদুরের কৌশলের কারণে পাণ্ডবরা বেঁচে যান। বিদুর সমস্ত তথ্য যুধিষ্ঠিরকে জানিয়ে দেন, ফলে পাণ্ডবরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

শকুনি পাশা খেলায় ছিলেন খুবই দক্ষ। এ খেলায় তাঁর তুল্য নিপুণ খুবই কম ছিল। এ খেলায় কারসাজি করতেও তিনি যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। পাশাখেলা যুধিষ্ঠিরের প্রিয় হলেও তিনি তেমন অভিজ্ঞ ছিলেন না। তাই পাশাখেলার আমন্ত্রণ জানানোর পরামর্শ দুর্যোধনকে শকুনিই দিয়েছিলেন। শকুনি দুর্যোধনকে বলেন,

দ্যূতপ্রিয়শ্চ কৌন্তেয়ো ন স জানাতি দেবিতুম্।
সমাহূতশ্চ রাজেন্দ্র! ন শক্ষ্যতি নিবর্ত্তিতুম্ ॥
দেবনে কুশলশ্চাহং ন মেঽস্তি সদৃশো ভুবি।
ত্রিষু লোকেষু কৌরব্য! তং ত্বং দ্যূতে সমাহ্বয় ॥

মহাভারত, সভাপর্ব, ৪৬/১৮-১৯[৩৩]

অর্থাৎ, যুধিষ্ঠিরের দ্যূতক্রীড়া খুব পছন্দ কিন্তু সে এ খেলা ভালোভাবে জানেনা। অতএব, তাকে যদি আহ্বান করো তাহলে সে না এসে পারবে না। হে দুর্যোধন, দ্যূতক্রীড়ায় আমি দক্ষ, ত্রিভুবনে আমার সমপর্যায়ে দক্ষ আর কেউ নেই। অতএব, তুমি যুধিষ্ঠিরকে এ খেলার জন্য আহ্বান করো।

ভালো-মন্দ মিশিয়েই সমাজ। সমাজে সব সময় কিছু কুটিল প্রকৃতির মানুষ থাকে। তারা মানুষকে কুবুদ্ধি দিতে ভালোবাসে। তাদের কুপরামর্শের কারণে সমাজের বহু ক্ষতি হয়ে যায়। বহু ভালো মানুষের জীবন নষ্ট হয়ে যায়। ভাইয়ে-ভাইয়ে তৈরি হয় দ্বন্দ্ব, সুখের সংসার ভেঙ্গে তছনছ হয়ে যায়। আত্মীয়-স্বজন প্রতিবেশীদের সাথে তৈরি হয় মনোমালিন্য, সমাজে তৈরি হয় বিশৃঙ্খলা। শান্তিপ্রিয় সমাজ অশান্তিতে ভরপুর হয়ে পড়ে। সমাজে এ ধরনের কুপরামর্শদাতা ও ধ্বংসাত্মক চিন্তাভাবনাকারী ব্যক্তিদের আমরা শকুনি মামা বলে অভিহিত করি। সমাজের কিছু কুচক্রী মানুষের কারণে যখন সমাজের স্বাভাবিক পরিবেশে বিঘ্ন ঘটে তখন মাঝে মাঝে আমরা বলি, এসব শকুনি মামাদের জন্য সমাজ রসাতলে চলে যাচ্ছে।

শনির দশা–খুব খারাপ সময় বোঝাতে 'শনির দশা' এ বাগ্‌ধারাটি ব্যবহৃত হয়। শনি হিন্দুধর্মের একজন দেবতা। তাঁর পিতার নাম সূর্যদেব ও মাতার নাম ছায়াদেবী। চিত্ররথের কন্যার সাথে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর স্ত্রী ছিলেন পতিব্রতা ও তেজস্বিনী। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের গণেশ খণ্ডের একাদশ অধ্যায়ে শনিকে নিয়ে একটি চমৎকার কাহিনি আছে। শনি ছিলেন কৃষ্ণভক্ত। একদিন শনি ধ্যানে রত ছিলেন। তাঁর স্ত্রী তখন ঋতুমতী ছিলেন। তিনি সুন্দর পোষাক ও অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে শনির কাছে এসে তাঁকে একান্তে পাওয়ার মনোভাব প্রকাশ করলেন। কিন্তু শনি ধ্যানমগ্ন হওয়ার কারণে স্ত্রীর দিকে তাকালেন না। ফলে স্ত্রী ক্ষুব্ধ হয়ে শনিকে অভিশাপ দিলেন এবং বললেন, শনি যার দিকে তাকাবেন সে বিনষ্ট হবে। ফলে শনি যেদিকে দৃষ্টি দেন তার ক্ষতি হয়। হর-পার্বতীর পুত্র গণেশ, জন্মের পর শিশু গণেশকে নিয়ে চারদিকে তখন উৎসব চলছে। ঋষিগণ গণেশকে দেখতে এসেছিলেন। শনিও এসেছিলেন। কিন্তু শনি স্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত অভিশাপের কথা মনে করে গণেশের দিকে তাকালেন না। কিন্তু পার্বতীর অনুরোধে শেষে গণেশের দিকে তাকালেন। তাকানো মাত্রই গণেশের মস্তক ছিন্ন হয়ে গেল। পুরাণে আছে,

সব্যলোচনকোণেন দদর্শ চ শিশোর্মুখম্।
শনেশ্চ দৃষ্টিমাত্রেণ চিচ্ছেদ মস্তকং মুনে।
চক্ষুর্নিবারয়ামাস তস্থৌ নম্রাননঃ শনিঃ।
প্রতস্থৌ পার্বতীক্রোড়ে তৎসর্বাঙ্গং সুলোহিতঃ।
বিবেশ মস্তকং কৃষ্ণে গত্বা গোলোকমীপ্সিতম্ ॥

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ–গণেশখন্ড ১২/৫-৭[৩৪]

> অর্থাৎ, শনি বালকটির দিকে দৃষ্টি দেওয়া মাত্রই বালকের মস্তক ছিন্ন হয়ে গেল। শনি সাথে সাথে তাঁর চোখ বন্ধ করলেন। শিশুটি রক্তাক্ত হয়ে মায়ের কোলে পড়ে রইল আর তাঁর মাথা গোলকে কৃষ্ণের দেহে মিশে গেল।

পুরাণের ঘটনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যার দিকে শনির দৃষ্টি পড়ে সে ধ্বংস হয়ে যায়। বর্তমান সমাজ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দেখি প্রত্যেক মানুষ জীবনে কোনো না কোনো সময় খুব খারাপ অবস্থার মধ্য দিয়ে কাটায়। জীবনে নেমে আসে ভয়ানক বিপর্যয়। এ বিপর্যয় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অথবা শারীরিক বা যে-কোনো কিছু হতে পারে। এরকম অবস্থায় আমরা পৌরাণিক দেবতা শনির কথা মনে করে বলে থাকি লোকটির ওপর শনির দশা বা দৃষ্টি পড়েছে।

শিখণ্ডী খাড়া করা–এ বাগ্‌ধারাটির অর্থ হচ্ছে কোনো ভালো কাজে বাগড়া দেওয়া। কোনো প্রস্তুত অনুষ্ঠান বা কাজ কারও সামনে আসায় পণ্ড হয়ে যাওয়া। শিখণ্ডী মহাভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ নারী চরিত্র। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি পাণ্ডবদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেন। পাণ্ডবদের যুদ্ধে জয়ের পিছনে তাঁর অবদান রয়েছে। শিখণ্ডীর জন্ম নিয়ে মহাভারতে একটি কাহিনি আছে। শিখণ্ডী পূর্ব জন্মে ছিলেন কাশিরাজের কন্যা, তাঁর নাম ছিল অম্বা। তাঁর অন্য দুই বোন ছিল অম্বিকা ও অম্বালিকা। ভীষ্ম তাঁর ভাই বিচিত্রবীর্যের সাথে বিবাহ দেওয়ার জন্য স্বয়ংবর সভা থেকে কাশীরাজের তিন কন্যাকে হরণ করেন। কিন্তু অম্বা ভীষ্মকে বলেছিলেন যে, তিনি পূর্বে শাল্বরাজকে মনে মনে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ভীষ্ম তখন তাঁকে শাল্বরাজের কাছে পাঠিয়ে দেন। যেহেতু ভীষ্ম তাকে হরণ করেছে তাই শাল্বরাজ তাকে গ্রহণ করতে রাজি হলেন না। অম্বা মনে মনে তাঁর এই দুর্দশার জন্য ভীষ্মকে দায়ী করলেন। তিনি গেলেন ভীষ্মের গুরু পরশুরামের কাছে প্রতিকারের জন্য। পরশুরাম অম্বাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণের জন্য ভীষ্মকে বললেন। কিন্তু ভীষ্মতো পূর্বে প্রতিজ্ঞা করে আছেন তিনি কখনও বিবাহ করবেন না। শেষে কোনো প্রতিকার না পেয়ে অম্বা ভীষ্মকে বধ করার জন্য প্রতিজ্ঞা করেন এবং শিবের তপস্যা শুরু করেন। তপস্যায় শিব সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বর দিলেন যে, তুমি পরজন্মে দ্রুপদের ঘরে জন্মগ্রহণ করে ভীষ্মকে বধ করতে পারবে। পরজন্মে অম্বা দ্রুপদ রাজার ঘরে কন্যা হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর নাম রাখা হয় শিখণ্ডী। পরে শিখণ্ডী এক যক্ষের বরে পুরুষত্ব প্রাপ্ত হন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শিখণ্ডী পুরুষ হিসেবে যোগদান করেন। এদিকে ভীষ্ম জানতে পারেন যে অম্বা শিখণ্ডী হিসেবে তাঁকে বধ করার জন্য জন্মগ্রহণ করেছেন। পূর্বে ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন স্ত্রীলোক, ক্লীব বা যে স্ত্রী পুরুষ হয়েছে বা অস্ত্রহীনের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করবেন না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের নবম দিন পর্যন্ত ভীষ্ম ভীষণ যুদ্ধ করেছিলেন। দশম দিনে ভীষ্ম মৃত্যুর চিন্তা করেই যুদ্ধক্ষেত্রে আসেন। শুরু হয় অর্জুনের সাথে যুদ্ধ। সেদিন অর্জুন শিখণ্ডীকে সামনে রেখে যুদ্ধ করছিলেন। শিখণ্ডীকে সামনে দেখে ভীষ্ম আর যুদ্ধ করলেন না। ভীষ্ম শিখণ্ডীকে বললেন,

> কামং প্রহর বা মা বা ন ত্বাং যোৎস্যে কথঞ্চন।
> যৈব হি ত্বং কৃতা ধাত্রা সৈব হি ত্বং শিখণ্ডিনী ॥
>
> মহাভারত, ভীষ্ম পর্ব, ১০৪/৪২[৩০]

> অর্থাৎ, তুমি তোমার ইচ্ছানুসারে আমাকে প্রহার করতেও পার, নাও পার। আমি কিন্তু কোনোভাবে তোমাকে প্রহার করব না। কারণ স্রষ্টা তোমাকে যে নারী রূপে সৃষ্টি করেছিলেন, তুমি সেই নারী শিখণ্ডিনীই আছ।

অর্জুন তখন তাঁকে বাণের দ্বারা জর্জরিত করে ফেলেন। পতন ঘটে পিতামহ ভীষ্মের। শিখণ্ডীকে সামনে রেখে ভীষ্মকে হত্যার যে কৌশল পাণ্ডবরা অবলম্বন করেছিলেন তা ছিল অসাধারণ কৌশল। যুদ্ধে বিভিন্ন ছলনার আশ্রয় না নিলে জয়লাভ সহজে হয় না। শিখণ্ডীকে

সামনে রেখে পাণ্ডবরা প্রকৃতপক্ষে ছলনার আশ্রয় নিয়েছিলেন। ভীষ্মকে পরাজিত করতে না পারলে পাণ্ডবরা এ যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারতেন না। আমরা আমাদের সমাজে দেখি অনেকে নিজ স্বার্থ হাসিলের জন্য অন্য জনকে সামনে দাঁড় করে দিয়ে অন্তরালে থেকে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করে। এ রকম ঘটনা ঘটলে আমরা এ বাগ্‌ধারাটি ব্যবহার করি।

পরিশেষে বলা যায়, সংস্কৃত ভাষা একটি অতি সমৃদ্ধ ভাষা। বাংলাভাষার উৎপত্তি সরাসরি সংস্কৃত ভাষা থেকে হয়নি। কিন্তু বাংলাভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব ব্যাপক। সংস্কৃত ভাষায় রচিত মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের বিভিন্ন কাহিনি খুবই চমকপ্রদ। ফলে বাঙ্গালি মানসে এই পৌরাণিক কাহিনিগুলো ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়। এগুলো সরাসরি আমাদের হৃদয়ে দাগ কাটে। আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে কথা-বার্তা, বক্তৃতা-বিবৃতিতে বারংবার এসব প্রসঙ্গ টেনে আনি। ফলে বাংলা ভাষায় আগমন ঘটেছে বহু পৌরাণিক ব্যাপার, যা বাগ্‌ধারায় পরিণত হয়েছে। সমাজের কোনো ঘটনার সাথে পৌরাণিক কোনো ঘটনা যখন মিলে যায় তখন আমরা স্বাচ্ছন্দ্যে এসব বাগ্‌ধারা ব্যবহার করি। এগুলো বাংলাভাষাকে করেছে আকর্ষণীয় এবং দিয়েছে ভাষার সৌকর্য। এসব বাগ্‌ধারার মূল ঘটনার উৎপত্তি সংস্কৃত সাহিত্যে হলেও এ বাগ্‌ধারাগুলো বাংলা ভাষার সম্পদ, বাংলা ভাষার অলংকার।

তথ্যনির্দেশ

১. তর্করত্ন, আচার্য্য পঞ্চানন (সম্পাদিত) [১৩৮৪]। *কালিকাপুরাণম্*। নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা।
২. তর্করত্ন, শ্রীপঞ্চানন (সম্পাদিত) [১৩৯৮]। *স্কন্দ-পুরাণম্* (ষষ্ঠ ভাগ), নাগর খণ্ড। নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা।
৩. চক্রবর্তী, ধ্যানেশনারায়ণ (সমূল অনুবাদ ও সম্পাদনা) [১৯৯৭]। *রামায়ণম্, দ্বিতীয় খণ্ড*। নিউলাইট, কলকাতা।
৪. ঐ।
৫. ঐ।
৬. ভট্টাচার্য্য, শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ (সমূল, সটীক অনুবাদ) [১৪২২]। *মহাভারতম্*। বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলিকাতা।
৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র (সম্পাদিত) [২০০৯]। *ভরত নাট্যশাস্ত্র*। নবপত্র প্রকাশন। কলিকাতা, পৃষ্ঠা ২৬৬।
৮. তর্করত্ন, আচার্য্য পঞ্চানন (সম্পাদিত) [১৩৯০]। *বিষ্ণুপুরাণম্*। নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা।
৯. ঐ।
১০. শাস্ত্রী, মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদনা ও অনুবাদ) [১৪১৬]। *মনুসংহিতা*। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা।
১১. ব্রহ্মচারী, মহানামব্রত (সম্পাদিত) [২০১৯]। *শ্রীমদ্ভাগবতম্* (দশম স্কন্ধ)। কলকাতা।
১২. প্রাগুক্ত
১৩. ঐ।
১৪. ঐ।
১৫. প্রাগুক্ত।
১৬. ঐ।
১৭. ঐ।
১৮. তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন (সম্পাদিত) [১৩৯৭]। *বায়ুপুরাণম্*। নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা।
১৯. প্রাগুক্ত।
২০. ঐ।
২১. ঐ।

২২. ঐ।
২৩. ঐ।
২৪. ঐ।
২৫. ঐ।
২৬. প্রাগুক্ত।
২৭. প্রাগুক্ত।
২৮. প্রাগুক্ত।
২৯. পণ্ডিত, কৃত্তিবাস (২০১৫)। *রামায়ণ*। কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা।
৩০. প্রাগুক্ত।
৩১. ঐ।
৩২. প্রাগুক্ত।
৩৩. প্রাগুক্ত।
৩৪. ভট্টাচার্য, হংসনারায়ণ (১৯৯৫)। হিন্দুদের দেবদেবীঃ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (দ্বিতীয় পর্ব)। ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, পৃঃ ১৩২-১৩৩।
৩৫. প্রাগুক্ত।